প্রথম প্রকাশ ঃ
১লা বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক ঃ
এন. সি. ঘোষ
৩২/৭, বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদ ঃ শ্রীঅমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীনেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স
৫৭/এ, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

মা ও বাবার

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সশ্রদ্ধ প্রণাম

লেখকের অন্যান্য বই :

বাঙালীজাতি পরিচয়

ক্রীড়া-সম্রাট্ নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী

কথাশিল্পী

প্যারীচাঁদ মিত্র ও সমকালীন কলকাতা (যন্ত্রস্থ)

পূর্বভাষ

হাসিটা হঠাৎ দুনিয়া থেকে দুর্লভ হয়ে পড়েছে। লোকে প্রাণখোলা হাসি হাসতে ভুলে গেছে। পল্লীতে-পল্লীতে, চণ্ডীমণ্ডপে, সান্ধ্য-সম্মেলনে, বৈকালীন-বৈঠকে, হাটেবাজারে, গঞ্জে-গঞ্জে আজকাল আর রসসিক্ত কৌতুকচিত্র দেখা যায় না। হাসির গল্প আর হাসির কথা আজ বিলাসের বস্তু। আর কি নিয়েই বা লোকে হাসবে? কোথায় সেই হাসির খোরাক। সভ্যতার গোলামিতে আর অর্থনৈতিক যূপকাঠে মানুষ তো সব মেসিনে রূপায়িত। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাঁধা-ছকে বন্ধ। দুধের লাইন, রেশনের লাইন, বাজার, অফিস, পার্টটাইম এগুলির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে রসসিক্ত মনগুলি তিক্ত হয়ে গেছে। দিলখোলা লোক যদিও মেলে, বিপর্যস্ত মন থেকে যদিও বা কিছু রসের নির্ঝরণ হয়, তা হয়ে ওঠে নিদারুণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বর্ষণ। রসনির্ঝর অনাবিল মুক্ত মনের কলধ্বনির বিকাশ আজকের দিনে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা কোথায়? কোথায় সেই বৈঠক, মজলিস যেখানে কর্মক্লান্ত মানুষগুলো দিনান্তে জড়ো হয়ে নির্ভেজাল আমোদে কাল কাটাতো, যেখানে গানে, কবিতায়, সাহিত্যে রসের ঝর্ণা ঝরতো? কোথায় সেই—

"এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ
তবু রঙ্গ ভরা—

আর কোথায় বা—

"ও কথা আর বলো
আর বলো না
বলছ বঁধু কিসের ঝোঁকে
এ বড় হাসির কথা, হাসির কথা
হাসবে লোকে
হাঃ হাঃ হাঃ হাসবে লোকে।"

তবুও একটা প্রবাদ আছে Laughter is still the best medicine—হাসির চেয়ে আর ভালো ওষুধ নেই—আর এও জানি 'নিষ্পাপ হাসি ভগবানেরই আশীর্বাদের ফল'।

বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী ঘাটা আমার নেশা—আর তার মাধ্যমেই অনেকের ব্যক্তিগত জীবনে তাঁদের পরিহাস-প্রিয়তার পরিচয় পাই ও সংগ্রহ করি। প্রায় বাইশ বছর হয়ে গেল—তখনকার কতকগুলি সাময়িক-পত্রে (মাসিক বসুমতী, মেদিনীবাণী, মর্মবাণী প্রভৃতিতে) 'সাহিত্যিক কৌতুকী' নাম দিয়ে কিছু-কিছু কৌতকচিত্র প্রকাশ করি। অনেকের কাছে উৎসাহিত হয়ে সেই দুষ্প্রাপ্য

বিক্ষিপ্ত কৌতুকচিত্রগুলি গ্রথিত হয়ে 'মনীষীদের কৌতুককণা'র আবির্ভাব। সেও আজ অনেক দিনের কথা। আজ আবার উৎসাহিত হয়ে নতুন কিছু কৌতুক চিত্র ও বৈঠকী গল্প সংযোজিত করে এই 'সাহিত্যিক কৌতুকী' পরিবেশিত হল—এই আশায় কিছু নবীন আর প্রবীণ পাঠক-পাঠিকারা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য হাসির প্রচণ্ড আক্রমণে বিব্রত হবেন আর জানতে পারবেন সেকালের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরর কেমন ছিলেন—তবেই আমার পরিবেশনের পরিশ্রম সার্থক বলে বিবেচিত হবে।

শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

অনাবিল হাস্যকৌতুক, রঙ্গচিত্র এঁদের ব্যক্তিগত জীবনে :

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)
রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)
প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)
মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)
দীনবন্ধু মিত্র (১৮২৯-১৮৭৩)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)
অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)
দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯০৯)
সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-১৮৮৯)
দ্বারিকানাথ অধিকারী (বুনো কবি) (?)
ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪)
কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪১-১৮৭০)
মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র (১৭১০-১৭৮২)
ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০)
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন (১৬৯৪-১৮০৬)
নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)
রসময় লাহা (১২৭৬-১৩৩৫)
দীননাথ ধর (১৮৪০—?)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬০-১৯১৩)
রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০)
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১০)
রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৫৫-১৮৯৩)
দাশরথি রায় (১৮০৪-১৮৫৭)
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১১-১৮৫৮)
রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২৩-১৮৮৫)
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)
দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০)
অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (১৮৫০-১৯০৯)
অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯)
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৩৯-১৯২৬)
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৮-১৯২৫)
গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬৭-১৯৩৮)
দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮২-১৯০৫)
মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় (১৮৬৮-১৯২৬)
বিধুশেখর শাস্ত্রী (১৮৭৯-১৯৫৯)
ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী (১৮৮০-১৯৬০)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)
শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাঠাকুর) (১৮৮২-১৯৬৯)
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭)
পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৬-১৯২৩)
অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ (১৮৭৯-১৯৪০)

॥ এক ॥

ঈশ্বরচন্দ্র যে বিদ্যার সাগর, করুণার সাগর তা সকলেই জানেন, কিন্তু তিনি যে রসেরও সাগর ছিলেন একথা অনেকেই জানেন না। ছেলেবেলা থেকে রসিকতার গন্ধ পেলেই আর তার সংগে সুযোগ পেলেই তিনি রসিকতা করতে ছাড়তেন না।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। সেদিন ছাত্ররা ক্লাসে পাঠ অধ্যয়ন করছে। কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার ক্লাসে এলেন। পাঠ নেবার আগেই ছাত্রদের বললেন, 'গোপালায় নমোঽস্তু মে' এই বাক্যটিকে চতুর্থ চরণ করে একটা শ্লোক রচনা করতে হবে। এরূপ শ্লোক রচনা করতে প্রায়ই তিনি ছাত্রদের দিতেন। বিদ্যাসাগর এই বাক্যটি শুনেই রসিকতা করে বললেন—

পণ্ডিত মশাই, কোন্ গোপালের বিষয় বর্ণনা করব? এক গোপাল (অর্থাৎ জয়গোপাল) দেখছি আমাদের সামনে উপস্থিত রয়েছেন, আর এক গোপাল বহুকাল আগে বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন, এ দুজনার মধ্যে কোন্ গোপালের বর্ণনা করব ?

ছাত্রের এই সুসংগত রহস্যজাত প্রশ্ন শুনে তিনি সহাস্যে বললেন—বেশ বেশ বৎস, বৃন্দাবনের গোপালের বর্ণনা কর।

*

আর একবার উক্ত অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালংকার সরস্বতী পুজো উপলক্ষে ছাত্রদের একটি শ্লোক লিখতে বলেন।

বিদ্যাসাগর শ্লোক লিখলেন—

লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং
জিলিপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম্।
যস্যাঃ প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ
সরস্বতী সা জয়তান্নিরন্তরম্।

*

বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ। সাধারণত তিনি তাঁর ছাত্রদের প্রতি শারীরিক শাস্তিদান পছন্দ করতেন না। তিনি প্রায়ই ক্লাসে ক্লাসে টহল দিয়ে বেড়াতেন।

একদিন তিনি দেখলেন একজন অধ্যাপকের ডেস্কের ওপর এক গাছা বেত রয়েছে। তিনি অধ্যাপককে আড়ালে ডেকে ক্লাসে বেত নিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

অধ্যাপক বললেন—ম্যাপ দেখানোর সুবিধের জন্য ওটি নিয়ে এসেছি।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। ম্যাপ দেখানোও হয় আর ছেলেদের পিঠে দু-এক ঘা বসানোও হয়, কি বলেন?

অধ্যাপক ঘাড় হেঁট করে রইলেন।

*

ছেলেবেলা থেকেই বিদ্যাসাগর মশাই খুব একগুঁয়ে ছিলেন। যা ভাল মনে করতেন তা তিনি প্রাণপণে করতে চেষ্টা করতেন। তাঁর একগুঁয়েমী ভাবের কথা একজন উল্লেখ করলে বিদ্যাসাগর মশাই হেসে বললেন—হব না কেন? জন্ম সময়ে ঠাকুরদা "এঁড়ে বাছুর" বলেছিলেন, আর জ্যোতিষের গণনায় আমার 'বৃষ' লগ্নে জন্ম—আমার একগুঁয়েমী থাকবে না তো থাকবে কার?

*

বিদ্যাসাগর মশাই কলকাতায় অবস্থান কালে কোনও বন্ধুর বাড়িতে এক বিয়ে উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। নানাপ্রকার হাস্যরসের অবতারণা করে অভ্যাগতরা আনন্দ উপভোগ করছিলেন। বিদ্যাসাগর বললেন—আজকাল বিয়েতে আর তেমন আমোদ নেই। সেদিন কি আর আছে? সেকালে বর বাসরঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই তাকে তার কনে খুঁজে বার করে নিতে হতো। ছাদনাতলায় শুভদৃষ্টির সময় একটিবার চার চক্ষের দেখা হয়, তারপর সেই দেখায় বাসরঘরে এসে কনে খুঁজে বের করা কত কঠিন কাজ সেকথা আর না বলাই ভালো।

তাঁর বন্ধুরা সকলেই তাঁকে তাঁর নিজের বাসরঘরের কথা বলবার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি তখন সুরু করলেন—

আমার বিয়ের সময় বাসরঘরে পা দিতে না দিতেই আমাকে তারা বলল—ওহে বর, তোমার কনে খুঁজে বের কর। কনে খুঁজে বের করতে হবে শুনে মহা মুস্কিলে পড়লুম। বাসরঘরে ঢুকেই আমি দেখলুম সেই মেয়ে-দঙ্গলের ভেতর থেকে আমার সেই অপরিচিতা অর্ধাঙ্গিনীকে খুঁজে বের করা আমার কর্ম নয়। আমি ভেবে চিন্তে শেষে আমারই বয়সের বেশ একটি ফর্সা টুকটুকে মেয়েকে ধরে বললুম—এই আমার কনে। যেমন ধরা অমনি এক মহা গণ্ডগোল সুরু হল। কে কার ঘাড়ে পড়ে, কে কোথা দিয়ে

পালাবে তার পথ পায় না। আমি যাকে ধরেছি, তাকে মোক্ষম ধরেছি। তার আর পালাবার উপায় নেই। তার হাত ধরে বললুম—তুমিই আমার কনে, তোমাকে হলেই আমার ঘর চলবে, আমি আর অন্য কনে চাই না। সে মেয়েটিতো বাপুরে মারে গেলুমরে বলে চীৎকার সুরু করলে। গিন্নীবান্নী গোছের দু একজন কাছে এসে বললে—ও তোমার কনে নয়, ওকে ছেড়ে দাও।

আমি বললুম—ছাড়ব কেন? খুঁজে নিতে বলেছ, আমি খুঁজে একেই বের করেছি, এটিই আমার বেশ মনের মতো কনে হবে। তারপর সেই মেয়েটি শেষে হাতে পায়ে ধরে বলল আচ্ছা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমার কনে বার করে দিচ্ছি। তাকে ছেড়ে দিলুম। তখনই তারা নিজেরাই কনে এনে হাজির করল।

বিয়ের বাসরে বিদ্যাসাগর মশাই এরূপ ভাবে আত্মীয়-স্বজনের হাত থেকে নিস্তার পেলেন, কেউ আর সারা রাত্রি তাঁকে জ্বালাতন করতে সাহস পেল না।

*

বিদ্যাসাগর মশায়ের বাবা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ছোট ছেলে ঈশানচন্দ্রকে ও বড় নাতি নারায়ণকে (বিদ্যাসাগর-পুত্র) অত্যন্ত ভালোবাসতেন। এত ভালোবাসতেন যে তাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র বলে বাড়ির অন্য কেউ তাদের শাসন করতে সাহস পেত না। এ খবর বিদ্যাসাগর মশায়ের কানে পৌঁছলে—তিনি একদিন দেশে এসে বাবাকে বললেন—বাবা, আপনি না নিরামিষাশী! আপনাকে কে নিরামিষাশী বলে? আপনি দুবেলা ঈশান ও নারায়ণের মাথা খাচ্ছেন, তবুও আপনি নিরামিষাশী।

বাবা শুনে হাসলেন, তবে সেই থেকে আদরের মাত্রা কিছু কম করলেন।

*

একবার কোন কার্যোপলক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর বাইরের ঘরে অনেকে আসেন। সে বৈঠকে জজ দ্বারকানাথ মিত্র ও রায়বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্র পাল উপস্থিত ছিলেন। পল্লীস্থ একজন অনবরত জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে দেখে বিদ্যাসাগর মশাই তাকে ডেকে পাঠালেন। সে ভয়ে সুড়সুড় করে নত মস্তকে তাঁর কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—বাপু অত উঁকিঝুঁকি মারছিলে কেন?

সে সভয়ে উত্তর করল—জজ দ্বারিক মিত্তির এসেছেন শুনে তাঁকে দেখবার জন্য উঁকি মারছিলুম। বিদ্যাসাগর বললেন—দেখবার জন্য উঁকি মারবার দরকার কি? ভেতরে এলেই তো পারতে। এঁকে চেন কি? এঁর নাম

কৃষ্ণদাস পাল। এঁর চেয়ে যিনি সুন্দর তিনিই দ্বারিক মিত্তির। এখন চিনে নাও দেখি কোনটি দ্বারিক মিত্তির ?

এঁদের কেউই সুপুরুষ ছিলেন না, উভয়ের গায়ের রং বেশ কালো। কাজেই ঘরে যত লোক বসে ছিলেন, সকলেই সমবেত উচ্চ রোলে হেসে উঠলেন। লোকটি নিতান্ত অপ্রস্তুত হয়ে পালাল।

*

বিদ্যাসাগর মশাই যখন দেশের সামাজিক আচারগুলির সংস্কারে ব্যস্ত ছিলেন—সেই সময় বারাসাতবাসী এক বন্ধু কালীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু আমের আচার স্বহস্তে তৈরি করে পাঠান। পরে উভয়ের দেখা হলে বিদ্যাসাগর আমের আচারের খুব প্রশংসা করেন। তাই শুনে কালীকৃষ্ণ বলেন তা হলে বিদ্যাসাগর, তুমিও স্বীকার কর, এদেশের সব আচার কু-আচার নয়, কেমন ?

*

এহেন বিদ্যাসাগর একদিন তাঁর নিজের বাড়িতে বৈঠকখানায় বসে কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ করছেন এমন সময় দুজন ধর্মপ্রচারক ও কয়েকজন কৃতবিদ্য ভদ্রলোক তাঁর কাছে এসে বসলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, ধর্ম নিয়ে তো বাংলাদেশে খুব হুলস্থুল পড়ে গেছে, যার যা ইচ্ছে, সে তাই বলছে, এ বিষয়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা নেই। আপনি ভিন্ন এ বিষয়ে মীমাংসা হবার উপায় নেই। বিদ্যাসাগর তাঁদের কথাটা শুনলেন। গম্ভীর ভাবে বললেন—ধর্ম যে কি তা মানুষের বর্তমান অবস্থায় জ্ঞানের অতীত। আর ধর্ম জেনেও কোন লাভ নেই। ধর্মের কথা আমি কিছু বলব না, বলে পরের জন্য বেত খেতে পারব না বাপু। ভদ্রলোক তো অবাক। বললেন—বেত খাওয়ার কথা কি বলছেন, বুঝলুম না তো ?

বিদ্যাসাগর—তবে শুনুন, একদিন যমরাজ তাঁর কাছারীতে বসে আছেন, এমন সময় প্রহরীরা এক ব্যক্তিকে তাঁর সামনে ধরে আনেন। যমরাজ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি অমুকের উপাসনা না করে অন্য জনার উপাসনা করে ছিলেন কেন ?

উপাসক বললেন—হুজুর, আমার কোনও দোষ নেই, ওমুক ধর্ম-প্রচারক আমাকে যা উপদেশ দিয়েছেন, তাই আমি করেছি।

এই কথায় যমরাজ তাঁকে পাঁচ ঘা বেতের আদেশ দিলেন এবং এক গাছতলায় বেঁধে রাখতে বললেন। তারপর আরও তিন-চার জন উপাসককে তাঁর সামনে আনা হল, তাঁরা ঐ একই উত্তর দিলেন এবং যমরাজ তাদের ঐ একই আদেশ দিলেন।

উপাসকদের পালা শেষ হলে একজন ধর্মপ্রচারককে আনা হল। তিনি বললেন—আমি বিদ্যাসাগরের উপদেশ শুনে অমুকের উপাসনা করেছি। আর আমার অনুগামীদেরও তাই করতে বলেছি।

যমরাজ তাকে তার হিসেবে পাঁচ ঘা, আর উপাসকদের এক-এক জনের দরুণ পাঁচ ঘা করে বেত্রাঘাতের হুকুম দিলেন। আরও দু-তিন জন ধর্মপ্রচারকের ডাক পড়ল, তাদেরও ঐ একই দণ্ড হল। অবশেষে ডাক পড়ল পালের গুরু বিদ্যাসাগরের। নিজের পক্ষে পাঁচ ঘা, প্রত্যেক উপাসকের দরুণ পাঁচ ঘা করে বেতের হুকুম হল। কয়েক শ বেত খাবার পর বিদ্যাসাগরের শরীরে আর তিলার্ধ জায়গা রইল না। অবশিষ্ট বেত প্রতিদিন গিয়ে খেয়ে আসতে হত।

এই কথা বলার পর বিদ্যাসাগর বললেন, পৃথিবীর আদিকাল থেকে মানুষ ধর্ম নিয়ে এইভাবে তর্ক করে আসছে, অনন্তকাল করবে, কোনও দিন মীমাংসা হবে না। ধর্ম বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে আমি বেত খেতে পারব না।

*

শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মধর্ম নেবার পর পৈতা ফেলেন, পরে সামাজিক পীড়নের ভয়ে কাশীবাসী হন। এই সংবাদ শুনে বিদ্যাসাগর দুঃখিত হন। কিছু দিন পরে শিবনাথ কাশী থেকে একবার কলকাতায় আসেন এবং বিদ্যাসাগরের সংগে দেখা করেন। দেখা হবার পর, বিদ্যাসাগর তাঁকে কাশীবাসের জন্যে দু কথা শুনিয়ে দেন। তারপরে বলেন—কি হারাণ, শুনলুম তুমি নাকি কাশীবাসী হয়েছ, গাঁজা খেতে শিখেছ কি? শাস্ত্রী উত্তর দেন—কাশীবাসের সংগে গাঁজা খাওয়ার কি সম্বন্ধ বুঝতে পারলুম না। বিদ্যাসাগর বললেন—এই সহজ আর সরল কথাটা বুঝতে পারলে না, জানো তো লোকের বিশ্বাস কাশীতে যার মৃত্যু হয়, তিনি সাক্ষাৎ শিব হন। শিব হলেন—পাঁড় গাঁজাখোর। কাশীতে মৃত্যুর পর তুমি যখন শিব হবে, তখন তোমাকেও তো গাঁজা খেতে হবে। তাই বলছিলুম—মরার আগেই যদি প্র্যাকটিশটা করে রাখতে, তাহলে শিব হতে সুবিধে হতো।

*

রামতনু লাহিড়ী ব্রাহ্ম হয়ে কাশীতে গিয়ে পৈতে ফেলে আসেন। বাপ বারবার নিষেধ করেন, বাপের সংগে তর্ক করে আলাদা বাড়িতে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

একদিন রামতনু বিদ্যাসাগরকে বললেন—ওহে, আমাকে একটা রাঁধুনি বামুন যোগাড় করে দিতে পার?

বিদ্যাসাগর বললেন—কেন হে, তোমার আবার বামুনের দরকার কি? বাবুর্চি খানসামা হলেও তো চলে।

রামতনু বললেন—হ্যাঁ, আমার কোনও আপত্তি নেই বটে, কিন্তু বাড়ির ভেতর যে বামুন ছাড়া চলবে না।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন - বাপের কথায় পৈতে গাছাটা রাখতে পারলে না, এখন পরিবারের কথায় বামুন খুঁজতে বেরিয়েছ?

রামতনু মাথা চুলকোতে লাগলেন।

*

বিদ্যাসাগর রেভারেন্ড লং-এর বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন। একদিন সেখানে বিদ্যাসাগরের বন্ধু কালীকৃষ্ণ মিত্রকে এক নেটিভ খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বাইবেলে মোজেস ও যীশুর যত সব miracle ঘটনার উল্লেখ আছে তার বর্ণনা খুব হাত-পা নেড়ে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন। কালীকৃষ্ণ ক্রমশ ত্যক্ত হয়ে পড়ছিলেন। বিদ্যাসাগর বসে শুনছিলেন।

এবার বিদ্যাসাগর বিপন্ন বন্ধুকে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে এলেন, বললেন—আহা কি করচেন সাহেব? এ লোকটা আপনার ওসব কিছুই বোঝে না। miracle আমি খুব বুঝি। যেমন ধরুন, আপনি জন্মাবামাত্র কারুর মামা হলেন, কারুর কাকা হলেন, এমন কি কারুর ঠাকুরদাদাও হতে পাবেন, কিন্তু বলুন তো কেউ জন্মাবামাত্র নিজের ভাইয়ের ছেলের জ্যাঠা হতে পারে কিনা? কিন্তু বলতে নেই আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি পুণ্য বাইবেলগ্রন্থের কৃপায় সে অঘটন ঘটিয়েছেন। অর্থাৎ এই জন্মেই একজন বড় রকমের জ্যাঠা হয়েছেন, এটা কি একটা প্রচণ্ড miracle নয়? আপনিই বলুন।

বিদ্যাসাগরের কথা শুনে সেই নেটিভ খ্রীস্টানটি আর সেখানে দাঁড়াননি। দ্রুত পায়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

*

বিদ্যাসাগর মশাই-এর কাছে এক গোঁড়া ব্রাহ্মণ দেখা করতে এলেন। সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউই এই অপরিচিত ব্রাহ্মণকে প্রণাম করলেন না। উপস্থিত ভদ্রলোকদের এই ব্যবহারে সেই ব্রাহ্মণ অপমানিত বোধ করলেন আর সেখানে যাঁরা অব্রাহ্মণ ছিলেন তাঁদের লক্ষ্য করে বললেন এই সব অর্বাচীনদের মনে রাখা উচিত যে ব্রাহ্মণেরা বর্ণশ্রেষ্ঠ, বেদজ্ঞ, এক সময় তাঁরা এদেশের কল্যাণসাধন করেছেন, তাঁরা সব সময় সকলেরই প্রণম্য।

বিদ্যাসাগর তাই শুনে হাসিমুখে বললেন—পণ্ডিত মশাই, শ্রীকৃষ্ণ একদিন

বরাহরূপ ধরেছিলেন বলেই কি ডোমপাড়ার যত শূকর আছে, তাদের ভক্তি বা প্রণাম করতে হবে।

ব্রাহ্মণের রাগ নিরসন হল।

*

কোনও এক সবজজ প্রথমা পত্নীর বিয়োগের পর পুনরায় বিবাহ করলে বিদ্যাসাগর তাঁকে বলেছিলেন—তোমার তো মরার পর স্বর্গে বাস।

সবজজ—কেন? স্বর্গে বাস কেন?

বিদ্যাসাগর—আমরা মরলে কিছুদিন নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে, তারপর স্বর্গে যেতে পারি, আর তুমি তো এখানেই নরক ভোগ করে মরার পর স্বর্গে যাবে।

*

স্বনামধন্য পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণকে বিদ্যাসাগর নিজের ভাই-এর মত স্নেহের চক্ষে দেখতেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ মশায়ের ভগিনীপতি। সেই সূত্রে বিদ্যাসাগর তাঁকে ভগিনীপতি সম্পর্কে সম্ভাষণ করতেন। ভট্টাচার্য মশাই দীর্ঘকাল কাশীবাস করছেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। সেবারে এসে বিদ্যাসাগর মশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভট্টাচার্য মশাইকে সাদরে অভ্যর্থনা করে আসনে বসিয়ে তামাক দিতে বলে তাঁকে বললেন—তুমি মরেছ না কি?

ভট্টাচার্য—কেন, আমি মরবো কেন? মলে কি আসতুম!

বিদ্যাসাগর—আমিও তো তাই বলি, না মলে কি আসতে? তা দেখো, আমাকে যেন পেয়ে বস না।

ভট্টাচার্য মশাই তামাক খেতে লাগলেন।

বিদ্যাসাগর—তোমায় শেষটা কাশীতে খেলে, মরবার বুঝি আর জায়গা পেলে না। তা গেছ বেশ করেছ, তবে যখন তখন এরকম কাশী থেকে সরে পড় কেন? জান তো কাশীধামের বাইরে মরলে কি হয়?

ভট্টাচার্য—হ্যাঁ, তাও তো জানি, গাধা হয়, তবুও মাঝে মাঝে আসতে হয়।

বিদ্যাসাগর—শিগগির শিগগির পালাও, না হলে কাশীর এপারে ওপারে, ভেতরে বাইরে অনেক ফারাক। বলি একটু গাঁজা-টাজা খেতে শিখেছ তো।

ভট্টাচার্য—কেন? গাঁজা খেয়ে কি হবে?

বিদ্যাসাগর—বলি একটু অভ্যাস রেখো, কি জান কখন কি কাজে লাগে বলা যায় না। মনে কর যদি তোমার কাশীপ্রাপ্তি হয়, তা হলে তো শিব হবে? শিব হলে তোমার নন্দীভৃঙ্গী যখন তোমার সামনে গাঁজার আলবোলা ধরবে

তখন টানতে হবে তো। আগে থেকে অভ্যাস না থাকলে দম আটকে মরে যাবে আর তোমার সাধের শিবত্ব ফসকে যাবে।

*

বিদ্যাসাগর মশাই রাজদরবারে নতুন উপাধি পেয়েছেন। একথা শুনে একজন পল্লীগ্রামের অধ্যাপক তাঁর সংগে দেখা করতে এলেন। বিদ্যাসাগর মশাইকে জিজ্ঞাসা করলেন—

নতুন উপাধিটা কি ?

বিদ্যাসাগর—সি আই ই

অধ্যাপক—তাতে হল কি ?

বিদ্যাসাগর—ছাই।

অধ্যাপক—সাধু সাধু। রাজার মুখে সবই শোভা পায়।

*

বিদ্যাসাগর মশাই-এর স্কুলের এক পণ্ডিত কতকগুলি সুভাষিত কবিতা রচনা করে তাঁকে পাঠ করতে দেন। পাঠ করে বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর কবিতাগুলির শেষে একটি সুভাষিত কবিতা লিখে দেন—

"জেনে রেখো এ জগতে
সকলেই গরু।
যে যারে ঠকাতে পারে
সেই তার গুরু॥"

*

বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামগুলিতে যখন প্রথম বংগ বিদ্যালয় স্থাপন করার নিয়ম হয়, তখন নর্ম্যাল বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না। ইনস্পেকটার ছিলেন বিদ্যাসাগর মশাই। তাকেই শিক্ষকদের পরীক্ষা করে বিদ্যালয়ে নিয়োগ করতে হতো। টোলের অনেক অধ্যাপক ভট্টাচার্য পরীক্ষা দিতে বিদ্যাসাগর মশাই-এর কাছে উপস্থিত হতেন।

একদিন এক টুলো ভট্টাচার্যের পরীক্ষা লওয়া হচ্ছে। বিদ্যাসাগর মশাই 'নীতিবোধে'র একটা জায়গা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'আমাদের আজীব, আরাম ও কার্যসৌকর্যার্থে যে সকল বস্তু আবশ্যক' এ সকলের মধ্যে 'আজীব' ও 'আরাম' শব্দের মানে কি ?

ভট্টাচার্য বললেন—জীবনং পর্যন্তং আজীবন (আজীব=জীবিকা) 'আর

'আরামঃ স্যাৎ উপবনম্' আরাম শব্দে উপবন বোঝায়। তারই উদাহরণ হচ্ছে—হা হা রামো হতো হতঃ।

উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর মশাই হাসি সংবরণ করতে পারলেন না। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন 'অভিপ্রায়' শব্দের অর্থ কি? বাংলায় উত্তর দেবেন, সংস্কৃতে নয়।

ভট্টাচার্য উত্তর দিলেন—এই তোমার অভিপ্রায়, আমার অভিপ্রায়, তাহার অভিপ্রায়।

বিদ্যাসাগর—শব্দের অর্থ বুঝিয়ে বলতে হলে কি রকম করে বলা উচিত?

ভট্টাচার্য—যেমন আমি স্কুলের পণ্ডিত হব, এই অভিপ্রায়ে আপনার কাছে পরীক্ষা দিতে এসেছি।

তারপর একটা জায়গা থেকে পড়তে দেওয়া হল। তিনি পড়তে লাগলেন—কাউণ্ট পডস্কি নামক এক সম্ভ্রান্ত লোক সস্ত্রীক শকটারোহণে বিয়ে না (বিয়েনা = ভিয়েনা) হইতে ক্রাকো গমন করিতেছিলেন।'

পড়ার ব্যতিক্রম দেখে বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন—কি পড়লেন, বিয়েনা হইতে ক্রাকো গমন করিতেছেন।

তিনি বললেন—আজ্ঞে তা বই কি, বিয়ে না হতে অর্থ, তখন তার বিয়ে হয়নি।

বিদ্যাসাগর—এর আগে যে সস্ত্রীক শব্দ আছে, বিয়ে না হলে সস্ত্রীক কি রকম করে হয়?

পণ্ডিত অনেকক্ষণ ভেবে উত্তর দিলেন—সাহেবদের ওরকম হয়।

*

বিদ্যাসাগর মশাই তাঁর নিজের গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের দরিদ্রদের প্রচুর সাহায্য করতেন। সেই জন্যই বোধ হয় লোকে তাঁকে খুব ধনী বলে মনে করত। একদিন তাঁর দেশের বাড়িতে ডাকাতি হয়। সেদিন তাঁরা সকলেই বাড়িতে ছিলেন। কিন্তু ত্রিশ-চল্লিশজন লোকের সামনে দাঁড়ানো তো সহজ কথা নয়। বিদ্যাসাগর সমেত বাড়ির সকলে খিড়কির দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। ডাকাতরা যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায়। রাত্রিতে ঘাটাল থানার দারোগাকে সংবাদ দেওয়ায় তিনি পরদিন এসে প্রথানুযায়ী গোলমাল করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর তখন অন্য ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে সামনের মাঠে কপাটি খেলছিলেন। তাঁর পিতা দারোগার মুখের ওপর তাঁকে কিছু দেওয়া হবে না বলে চলে গেলেন। দারোগাবাবু তখন ফাঁড়ীদারকে বললেন—এ বামুনের (ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়) এত কি তেজ যে আমি দারোগা, আমার মুখের ওপর জবাব দেয়—এক পয়সাও দেব না; আর বিদ্যাসাগরকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এ ছোঁড়াটা কি রকম

লোক যে কাল বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে আর আজ সকালেই সে কপাটি খেলছে। আমাদের দিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই। মজাটা দেখাচ্ছ।

ফাঁড়ীদার বললেন—হুজুর ইনি সামান্য লোক নন, ইনি দেশে এলে জহানাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এখানে এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—আর কলকাতার বড়লাট ছোটলাট এঁর বন্ধু। এর কথামত জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বহাল হয়।

দারোগা শুনে চুপ হল, মুখ বুজে তদন্ত করলে—কিন্তু কিছু কিনারা হল না।

বিদ্যাসাগর কলকাতায় ফিরে এলে ছোটলাট হ্যালিডে সাহেব বিদ্যাসাগরকে বললেন—তুমি অতি কাপুরুষ। বাড়িতে ডাকাতি হল—আর বিষয় রক্ষা না করে পালিয়ে গেলে, লজ্জার কথা।

বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন—পালালেও দোষ না পালালেও দোষ। যদি আমি না পালাই ওরা চল্লিশ জন আমাকে মেরে ফেলত, তখন বলতেন—গোঁয়ারতুমী করে প্রাণটা খোয়ালে আর পালিয়ে তো এই পরিণাম।

হ্যালিডে হাসতে লাগলেন।

*

কান্তিচন্দ্র রাঢ়ী বালি-ব্যারাকপুর বঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত। তিনি এক সময় পাঠাগারের বই সংগ্রহের জন্য কলকাতায় বিদ্যাসাগর মশাই-এর বাড়িতে আসেন। বিদ্যাসাগর মশাইকে তিনি আগে কখনও দেখেন নি। সুতরাং তাঁকে তখন তিনি চিনতেন না। বিদ্যাসাগরের বাড়িতে বৈঠকখানায় তখন অনেক লোক বসেছিলেন আর তিনি সামনের রোয়াকে বসে দাড়ি কামাচ্ছিলেন। ঘরের মধ্যে চৌকীর ওপর এক ভদ্রলোককে দেখে তাঁকে বিদ্যাসাগর ভেবে কান্তিচন্দ্র তাঁর কাছে আবেদন জানালেন। তিনি বাইরে বিদ্যাসাগরকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দেখিয়ে দিলেন। বিদ্যাসাগর তা দেখে বললেন—আজকাল দেখছি সবারই উঁচু দিকে নজর, নিচের দিকে দৃষ্টি পড়বে কেন?

তাতে কান্তিচন্দ্র কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিলেন—ঈশ্বর সর্বব্যাপী হলেও আমরা তাঁর আশায় উঁচু দিকেই চাই।

এই উত্তর শুনে বিদ্যাসাগর মশাই খুব খুসী হলেন, আর তাঁর প্রার্থনাও মঞ্জুর করলেন।

*

একবার কোনও এক সম্ভ্রান্ত লোক বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে ও তাঁর বইগুলি দেখতে এসেছিলেন। বিদ্যাসাগর মশায়ের সখ ছিল বইগুলি খুব

ভালো করে বাঁধিয়ে রাখা ও তাতে প্রচুর অর্থ-ব্যয় করা। ভদ্রলোক বইগুলি দেখে বললেন—এরূপ এত খরচ করে বইগুলি বাঁধানো কি প্রয়োজন?

তদুত্তরে বিদ্যাসাগর মশাই বললেন—কেন? দোষ কি?

প্রত্যুত্তরে বাবু বলেছিলেন—ঐ টাকায় অনেকের উপকার হতে পারতো।

বিদ্যাসাগর মশাই তখন আর কিছু না বলে অন্য কথায় গেলেন। শেষে বসে তামাক খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার এই শাল জোড়াটি বেশ, কোথায় কত টাকা দিয়ে কিনেছেন।

বাবু একটু উৎফুল্ল হয়ে তাঁর শালের নানা রকম গুণ বর্ণনা করে বললেন—এ জোড়াটি পাঁচশ টাকায় খরিদ ছিল।

বিদ্যাসাগর অমনি বললেন—পাঁচ সিকের কম্বলেও তো শীত ভাঙে, তবে এত টাকার শাল জোড়াটি গায়ে দেবার প্রয়োজন কি? এ টাকায় তো অনেকের উপকার হতে পারতো। আমিতো মোটা চাদর গায়ে দিয়ে থাকি।

বাবুর সুবর্ণ মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গেল। ক্ষণকাল লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলেন, পরে বললেন—আমি বড় অন্যায় করেছি, ক্ষমা করবেন।

রহস্যপ্রিয় বিদ্যাসাগর মশাই হেসে সমস্ত বিষয় উড়িয়ে দিলেন। যেন কিছুই হয় নি। কিন্তু বাবুটি যতক্ষণ রইলেন, তাঁর চিত্তের প্রসন্নতা আর রইল না।

*

সদরালা দিগম্বর বিশ্বাস তখন বর্ধমানে। তখন প্রায়ই তাঁর বাড়িতে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, সঞ্জীব, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতির সাহিত্যের আসর বসত।

একদিন সেরূপ আসর বসেছে, সেদিন ভোজনের ব্যবস্থা ছিল। বিদ্যাসাগর সহস্তে রেঁধে ছিলেন। খাদ্যতালিকা ছিল—ভাত, মাংস ও আমাদা দিয়ে পাঁঠার মিটুলির অম্বল। বিদ্যাসাগর নিজে পরিবেশন করছেন। বঙ্কিমচন্দ্র খেতে খেতে বললেন—এমন সুস্বাদু অম্বল তো কখনও খাইনি।

সঞ্জীব বললেন—হবে না কেন? রান্না কার জান তো, বিদ্যাসাগরের।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—না হে না, বঙ্কিমের সূর্যমুখী আমার মত মূর্খ সূপকার (রাঁধুনি বামুন) দেখেনি।

*

বিদ্যাসাগর নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াতে খুব ভালো বাসতেন। পরিবেশন করবার সময় বলতেন।

"হুঁ হুঁ দেয়ং হাঁ হাঁ দেয়ং দেয়ঞ্চ করকম্পনে।
শিরসি চালনে দেয়ং ন দেয়ং ব্যাঘ্রঝম্পনে॥"

[হু‍ঁ হু‍ঁ করলে দেবে, হাঁ হাঁ করলে দেবে, হাত নাড়লে দেবে, মাথা নাড়লে দেবে, কিন্তু বাঘের ঝাঁপের মতো হাত পাতায় রাখলে দেবে না।]

*

বিদ্যাসাগর মশাই ছোট ছোট করে চুল ছাঁটতেন, সামনের দিক কামানো, কপাল প্রশস্ত, পায়ে চটি।

একদিন তিনি বিশেষ কাজে হন-হন করে হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁকে দেখে একটি ছেলে তার সংগীকে বললে—দ্যাখ, দ্যাখ 'উড়ে' যাচ্ছে।

কথাটা বিদ্যাসাগর মশাই-এর কানে গেল। তিনি থামলেন। ছেলেটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি জেনে বললে হে ছোকরা? কাকে 'উড়ে' বললে?

ছেলেটি থতমত খেয়ে গেল। আমতা আমতা করে বললে—আজ্ঞে তাতো আমি বলি নি। বলছিলুম আপনি এত তাড়াতাড়ি যাচ্ছেন যেন মনে হচ্ছে উড়ে যাচ্ছেন।

ছেলেটির উপস্থিত বুদ্ধি দেখে তাকে তারিফ করলেন, সামনের দোকান থেকে মিঠাই কিনে খাওয়ালেন।

*

বিদ্যাসাগর চটি পরার জন্য অনেক বিড়ম্বনা পেয়েছেন। পটলডাঙার রাস্তা দিয়ে একবার তিনি খুব তাড়াতাড়ি যাচ্ছিলেন। রাস্তায় ধুলো। পায়ে চটি। পাশ দিয়ে কোন ধনী ঘরের বিধবা মহিলা যাচ্ছিলেন। দ্রুত যাওয়ায় তাঁর চটির ধুলো মহিলার গায়ে লাগে। মহিলাটি তাতেই চটে-মটে বললেন—আঃ মর উড়ের আবার তেজ দেখ।

বিদ্যাসাগর কোন কিছুই না বলে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

*

এক সময় বিদ্যাসাগর দেশে এক বাল্য বন্ধুর সংগে কথা বলতে বলতে বন্ধুর গ্রামের পথে চলছিলেন। পথ অত্যন্ত নোংরা। বন্ধুটি বললেন - ওহে ভালো করে দেখে চল— পথের ধারে ধারে গু।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—দূর, তোদের গ্রামে কি গু আছে—সব গোবর। অর্থাৎ মানুষ নেই—সব গরু।

*

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধু সজ্জন ব্যক্তিদের দর্শন করে খুবই সুখ পেতেম। বিদ্যাসাগরের অনেক কথা তিনি শুনেছিলেন! বলেছিলেন—বিধাতার কৃপা

আর ভক্তি ছাড়া তাঁর মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব হয় না। তাই তিনি তাঁর সংগে একদিন বিকেলে দেখা করতে এলেন। পরমহংসদেব আসবামাত্র বিদ্যাসাগর তাঁকে সাদরে আহ্বান করতে যেমন এগিয়ে আসবেন অমনি পরমহংসদেব বললেন—খাল, বিল, পার হয়ে এবার সাগরে এসে পড়লুম।

রামকৃষ্ণদেবকে বসিয়ে প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বললেন—এসে পড়েছেন, আর তো উপায় নেই, দু-এক ঘটি নোনা জল তুলে নিয়ে খান। এই সাগরে নোনা জল ছাড়া আর কিছুই পাবেন না।

পরমহংস বললেন সাগর তো কেবল লবণ নয়, ক্ষীর সমুদ্র, দধি সমুদ্র, মধু সমুদ্র প্রভৃতি আরও অনেক সমুদ্র আছে। আপনি তো অবিদ্যার সাগর নন, বিদ্যার সাগর, আপনাতেই রত্ন লাভই হয়ে থাকে, যখন এসেছি তখন রত্ন নিয়ে যাব। নোনা জল কেন নিয়ে যাব?

এরূপ আলোচনা বহুক্ষণ চলল। ক্রমে রাত হল। এবার বিদায় নেবার পালা। তাই যাবার সময় পরমহংসদেব বিদ্যাসাগরকে একবার দক্ষিণেশ্বরে রানী রাসমণির বাগানে যাবার জন্য অনুরোধ করলেন আর ঐ সংগে করলেন একটু তাত্ত্বিক রসিকতা—আমরা জেলে ডিঙি, খাল, বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি, কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি যদি যেতে গিয়ে চড়ায় লেগে যান। অবশ্য এ সময়ে জাহাজও যেতে পারে।

বিদ্যাসাগর হেসে বললেন—হ্যাঁ এটা বর্ষাকাল বটে, জাহাজ আটকাবার সম্ভাবনা নেই।

॥ দুই ॥

হিন্দু কলেজে পাঠ কালে মাইকেল মধুসূদনের গণিতের চর্চা ভালো লাগত না। সাহিত্যচর্চাই তাঁর ভালো লাগত। একদিন ভূদেব প্রভৃতি সহপাঠীদের সংগে সেক্সপীয়ার ও নিউটনের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ তাই নিয়ে তর্কাতর্কি হয়। মধুসূদন সেক্সপীয়ারের পক্ষ অবলম্বন করে বলেন—সেক্সপীয়ার চেষ্টা করলে নিউটন হতে পারতেন, কিন্তু নিউটন শত চেষ্টা করলেও কখনও সেক্সপীয়ার হতে পারতেন না। সেদিন তর্ক শেষ হল, মীমাংসা হল না। তারপর একদিন গণিতের ক্লাস। অধ্যাপক রীজ সাহেব এক জটিল গণিতের প্রশ্নের সমাধান করতে দিলেন—কোন ছাত্রই তা সমাধান করতে পারলে না। তখন মধুসূদন খড়ি হাতে নিয়ে বোর্ডে

গিয়ে সেই জটিল প্রশ্নের সমাধান করে দিলেন। সেদিনকার কথা তাঁর মনে ছিল—তাই হাসতে হাসতে সহপাঠী প্রতিপক্ষকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে বললেন—And so Shakespeare could be Newton if he tried.

এই কথা বলে গর্বভরে নিজের আসনে বসলেন।

*

রাজনারায়ণ বসু একদিন মধুসূদনের সঙ্গে দেখা করতে যান। সেদিন মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখছিলেন। তখনও বইখানি বের হয় নি। রাজনারায়ণকে দেখেই মধু বলে উঠলেন—My dear Raj, this will surely make me immortal.

রাজনারায়ণ বললেন—তাতে আর সন্দেহ নেই, যেদিন এ বই বেরুবে সেদিন তুমি অমর হবে নিশ্চয়।

তখন তিনি রহস্য করে বললেন—ভবিষ্যদ্‌বংশীয় হিন্দুরা বলবে যে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হয়ে মধুসূদন দত্ত নাম নিয়েছিলেন আর শ্বেতদ্বীপে গিয়ে যবনী বিবাহ করেছিলেন।

বলেই হাসতে লাগলেন।

*

মেঘনাদবধ-কাব্য যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন একদিন মধুসূদন কোন কাজের জন্য চীনাবাজারে গিয়েছিলেন। সেখানে দেখেন এক দোকানদার তার দোকানের সামনে বসে একমনে 'মেঘনাদবধ' পাঠ করছে।

রহস্যপ্রিয় কবি কৌতূহলাবিষ্ট হয়ে দোকানে ঢুকে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই কি বই পড়ছেন?

দোকানী বললে—আজ্ঞে এ একখানি নতুন কাব্য।

মধুসূদন—কাব্য, বাংলা ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাই নেই, তা আবার কাব্য।

দোকানী—সে কি মশাই, মাত্র এই একখানি কাব্যই তো যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্বিত করতে পারে।

মধুসূদন—তাই নাকি, কি রকম কাব্য, একটু পড়ুন তো দেখি।

এই কথা শুনে সেই সাহিত্যপ্রিয় দোকানী সাহেববেশী মধুসূদনের মুখের দিকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখে তাঁকে বললেন—আমার মনে হয় আপনি এ বইয়ের ভাষা ঠিক বুঝতে পারবেন না।

মধুসূদন—কেন ? এর ভাষাটা কি খুব কঠিন নাকি ? ভালো, একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি—

অগত্যা সেই দোকানদার যেখানে পড়ছিল—সেই অংশ পাঠ করতে লাগল—

" .....বাঁচালে দাসীরে

আশু আসি তার পাশে হে রতিরঞ্জন।" ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরে সে থামলে, মধুসূদন তার হাত থেকে বইখানি নিয়ে তাঁর গুরুগম্ভীর স্বরে নিজে পাঠ করতে লাগলেন। তাঁর পাঠের ভাবভঙ্গি দেখে, উচ্চারণের লালিত্য শুনে মুগ্ধ হয়ে বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে—মশাই, আপনি এখানে কোথায় থাকেন ?

মধুসূদন সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, এই অমিত্রাক্ষর ছন্দ বাংলা ভাষায় চলবে কি ?

দোকানী—খুব চলবে মশাই, খুব চলবে, এ একটা নতুন সৃষ্টি, নতুন ছন্দ···আরও কি বলতে যাচ্ছিল, মধুসূদন তখন আনন্দে হাসতে হাসতে ব্যস্তভাবে তার সঙ্গে করমর্দন করে সেখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

*

কৃষ্ণনগরের মহারাজা সতীশচন্দ্র মধুসূদনের পরম বন্ধু ছিলেন। একদিন দুজনে বেড়িয়ে ফিরে যখন রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করছেন, তখন পশ্চাৎবর্তী মধুসূদন হেসে মহারাজকে বললেন—I see Krisnachandra followed by Bharatchandra.

মহারাজা বললেন—একদিন ভারতচন্দ্র বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রধান আসন গ্রহণ করেছিলেন, এখন আপনি সে আসন কেড়ে নিয়েছেন।

মধুসূদন তাই শুনে হাসতে হাসতে বললেন—ভারতচন্দ্রকে আপনারা তিন শ টাকার গাঁতি দিয়েছিলেন, আমাকে কি দেবেন ?

মহারাজা তখন দুঃখের সঙ্গে বললেন—আমার যদি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো সম্পত্তি থাকত, আপনাকে ত্রিশ হাজার টাকার জমীদারী দিতুম।

*

অফিসের কাজের ছুটির পর মধুসূদন প্রায়ই পাইকপাড়া রাজবাড়িতে যেতেন। একদিন অপরাহ্ণে কিছু লিখতে লিখতে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্দেশ করে বললেন—আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় হল, আমার সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করুন।

রাজা ভাবলেন—এ আবার কি ? খ্রীস্টানের আবার সন্ধ্যা-আহ্নিক কি ? জিজ্ঞাসা করলেন—ব্যাপার কি ?

মাইকেল হাসিমুখে বললেন—গেলাসরূপ কোষায় দুই আউন্স পেগরূপ গঙ্গাজলে আচমন কার্য সমাধানে আহ্নিককৃত্য অনুষ্ঠান করতে হবে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র মধুর হাস্যে মধুসূদনের অপরূপ সন্ধ্যা-আহ্নিকের ব্যবস্থা করলেন।

*

কোন এক সময়ে পাইকপাড়ার রাজবাড়িতে এক ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মহতী সভা হয়। ঐ সময় বহু সোনার ও রুপোর হুঁকো বার করা হয়। মাইকেলের জন্যও একটা সোনার হুঁকো এল। মাইকেল পণ্ডিতদের রহস্য করে বললেন—ঠাকুর মহাশয়েরা এ দাসের হুঁকাটি মারবেন না, আমার জাত গেলে আর জাত পাব না।

*

ভূদেববাবুর অনুরোধে মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনা করেন। বৈষ্ণবগণ মহাজন-পদাবলীর মতো এই প্রাণমনোহারিণী মধুর কবিতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। নবদ্বীপবাসী এক পরম বৈষ্ণব এতদূর মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি মধুসূদনকে দেখবার জন্য কলকাতায় আসেন। মধুসূদনের পরিচয় তিনি জানেন না। কলকাতায় এসে অনেক খুঁজে মধুসূদনের বাড়িতে এলেন। দেখলেন এক সাহেববেশী কৃষ্ণকায় ব্যক্তি ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে কি লিখছেন। বাড়ির আবহাওয়া সাহেবীপনা।

বৈষ্ণব ভুল করে বাড়িতে ঢুকছেন মনে করে যেমন বেরোতে যাবেন—অমনি মধুসূদন কৌতূহলী হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কাকে খুঁজছেন ?

বৈষ্ণব—এ বাড়িতে কি মধুসূদন বলে কোনও লোক থাকতেন।

মধুসূদন—কেন ? তাঁকে আপনাব কি প্রয়োজন ?

বৈষ্ণব—মশাই, আমি তাঁর ব্রজাংগনা-কাব্য পড়ে মুগ্ধ হয়ে সেই পরম বৈষ্ণব পুণ্যবান মধুসূদনকে একবার দেখব বলে নবদ্বীপ থেকে ছুটে এসেছি। তিনি এখন কোথায় থাবেন বলতে পারেন কি ?

মধুসূদন ঈষৎ হেসে বিনয় সহকারে বললেন—আমারই নাম মধুসূদন।

মধুসূদনের কথায় বৈষ্ণব তো একেবারে স্তম্ভিত, নির্বাক, হতবুদ্ধি হয়ে কিছুকাল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপরে আবেগ ভরে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন—

বাবা, তুমি শাপভ্রষ্ট, গৌর-অবতারে 'কালো অঙ্গ' গৌর করে এসেছিলে, এবার কি তাই আবার কালোরূপে মধুসূদন হয়ে এসেছ?

মধুসূদন হাসলেন কি ভাবে অভিভূত হয়ে পড়লেন—বলা যায় না।

*

একবার বার লাইব্রেরীতে মধুসূদন বিশ্রাম করছিলেন, এমন সময় এক উকীল তাঁকে বললেন—মশাই, 'মেঘনাদবধের' নরকবর্ণনাটা আপনি নিশ্চয়ই মিলটন থেকে নিয়েছেন, ঠিক না? মধুসূদন হেসে মহাকবি দান্তের 'নরকবর্ণনা' কতকটা আবৃত্তি করে শোনালেন, তারপর আবার মিলটন থেকে 'নরকবর্ণনা' শোনালেন। পরে বললেন—এই দেখুন, মিলটন যেখান থেকে ভাব গ্রহণ করেছেন, আমিও সেখান থেকে নিয়েছি।

আবার বললেন—গঙ্গাজল যদি খেতে হয় তবে সাধ্য হলে হরিদ্বারের নির্মল জল খাওয়াই উচিত, কলকাতার গঙ্গার নোনা জল না খেয়ে।

*

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও বহু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। মাইকেলের তিনি বন্ধু ছিলেন। উভয়ের মধ্যে মাঝে মাঝে বেশ তর্ক হতো। রাজেন্দ্রলাল একবার নিজের বংশমর্যাদার কথা খুব জাঁক করে মাইকেলকে শোনাতে লাগলেন। তাতে মাইকেল রহস্য করে বললেন—কিন্তু যতই বল তুমি দাদা, knave, slave, বামুনের মোট মাথায় করে তোমার বাপ-দাদারা বাঙলায় আসেন, আর আমি 'দত্ত' কারো ভৃত্য নই।

*

একবার মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র কৃষ্ণনগর থেকে নদী পার হবার জন্যে খুব ভোরে ঘাটে এসেছেন। খেয়াঘাটের মাঝি নৌকোর ভেতর গভীর ঘুমে মগ্ন। দীনবন্ধু নৌকোর কাছে তীরে দাঁড়িয়ে মাঝিকে ডাকতে লাগলেন—ও বাবা মাঝি, একবার ওঠ। উঠে, আমাদের পার করে দিয়ে আবার ঘুমোও। দীনবন্ধুর ক্ষীণ কণ্ঠ মাঝির কানে গেল না। তখন মধুসূদন বললেন—ওরকম করে ডাকলে কি মাঝি সাড়া দেবে? তখন তিনি সাহেবি ঢং-এ বললেন—Oh, you, বলে গুরুগম্ভীর ভাবে ডাকা মাত্র মাঝির ঘুম ভেঙে গেল। সে ধড়ফড় করে উঠে তাঁদের নৌকোয় তুললে। নৌকো ছেড়ে দিল। দীনবন্ধু রঙ্গ করে বলেছিলেন—

"সেই ঘাটে খেয়া দিল তন্দ্রালু পাটুনী
ত্বরায় বাহিল নৌকা 'মধু' স্বর শুনি।"

*

কুচবিহারের মহারাজার সংগীত শিক্ষক ও 'গীতসূত্রধার' রচয়িতা একবার মাইকেলের শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ে 'শর্মিষ্ঠা'র অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি একদিন মাইকেলের সংগে দেখা করতে আসেন। সে সময় দীনবন্ধু মিত্তিরও উপস্থিত ছিলেন। দীনবন্ধুর সংগে মাইকেল তাঁর পরিচয় করে দিতে বললেন, ইনি আমাদের লাইনে আছেন হে।

দীনবন্ধু ঠিক বুঝতে না পেরে বললেন—ইনি কি lawyer ?

মধুসূদন বললেন—নাহে, না, ইনি নাট্য-শিল্পবিদ, আমাদেরই লাইন তো, কেমন হে।

*

রত্নাবলী নাটকের মহড়া। পাইকপাড়ার রাজাদের উদ্যানবাটিকার হলে সোফায় বসে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর আর মধুসূদন। নাটক সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছে।

মধুসূদন বললেন—বাংলা নাটকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তিত না হলে নাটকের প্রকৃত উন্নতির আশা নেই।

যতীন্দ্রমোহন—প্রবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। কারণ অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য ও শব্দবিন্যাস বাংলা ভাষায় উপযোগী নয়।

মধুসূদন—আপনার সংগে এ বিষয়ে একমত নই—একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

যতীন্দ্রমোহন—কেন আপনার মনে নেই, ঈশ্বর গুপ্তের লেখা—

"কবিতা কমলা কলা পাকা যেন কাঁদি
ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।"

*

মধুসূদন একদিন ঝামাপুকুরের রাজা দিগম্বর মিত্রের বাড়িতে কোনও সামাজিক উৎসবে নিমন্ত্রণে এসেছেন। সকলে ধুতি, চাদর পরে এসেছেন কেবল মধুসূদন এসেছেন কোট পাতলুন পরে। তাঁকে দেখে দিগম্বর মিত্র বললেন—মাইকেল, আজকে তুমি কাপড় পরে এলে না কেন ?

মধুসূদন হেসে বললেন—কাপড় পরে আসলে গাড়ু-গামছার দরকার। এটা ruling race-এর পোষাক—এতে সে ভয় নেই।

*

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জামাই হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে 'কিছু কিছু বুঝি' নামে এক প্রহসন নাটকের অভিনয় হয়। মাইকেল অভিনয় দেখতে

আসেন। অভিনয় শেষে তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে চীৎকার করে উঠলেন—'মুত্তিকে রে বাবা, মুত্তিকে' অর্থাৎ এই অভিনয় আগেকার সব অভিনয়কে মাটি করে দিলে।

*

চুঁচুড়ার সরকারী উকীল কবি দীননাথ ধর। তিনি 'উষাচরিত' 'কংস-বিনাশ' প্রভৃতি কয়েকখানি বই লিখেছিলেন। 'বিবিধ চাটনী ঢাকাই আমদানী' নাম দিয়ে চুটকী কৌতুককণাও লিখতেন। মধুসূদনের সংগে তাঁর গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ। তা হলেও দুজনের মধ্যে রসিকতা চলত। দীননাথ একদিন কবিতা লিখে মাইকেলকে দেখালেন। মাইকেল পড়ে বললেন—এতো poetry নয়, এযে pottery.

তখন মাইকেল লালবাজারে থাকতেন। মাইকেল একদিন রহস্য করে বললেন—দেখ দীনু, লালবাজারে এসে লালপানি খাওয়াই সংগত, আবার লালপানি খেলেই লালবাজারে গতি হয়। সৌরচক্র কিনা। তুমি কিন্তু দেখতে পাই—কেবল সাদা জলই খাও। লালবাজারের লালপানিও খেলে না, টলেও পড়লে না, বেশ খাড়া আছ।

*

মাইকেলের বাড়ি। দীননাথ এসেছেন। মাইকেল তখন 'পদ্মাবতী' নাটক লিখতে আরম্ভ করেছেন। সেই নাটকে কয়েক স্থানে 'ও' শব্দটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। দীননাথ জিজ্ঞাসা করলে—তাতে মাইকেল বললেন—'ও' শব্দটা কেবল প্রতিধ্বনি মাত্র। দূরে প্রতিধ্বনি হল, তার ধ্বনি মাত্র।

মাইকেলের পত্নী মাইকেলকে সম্বোধন ছলে 'dear' বললেই তিনিও 'dear' বলে উত্তর দিতেন। সেদিনও দীননাথের সামনে পত্নীর ডাকে dear-এর উত্তর dear বলতেই দীননাথ সহাস্যে বললেন—মিঃ দত্ত, আপনি দেখছি পরমাসতী মিসেস দত্তের প্রতিধ্বনি।

*

চুঁচুড়ার বিখ্যাত ধনী নকুড়বাবুর বৈঠকখানায় ফরাসপাতা বিছানায় হঠাৎ জল পড়লে নকুড়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কে বিছানায় জল ফেলেছে? নকুড়বাবুর কর্মচারী নিবারণ উত্তর দিলেন—দু হাতে খানিকটা জল নিয়ে এইমাত্র দীনুবাবু এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন—তিনি নিশ্চয়ই জল ফেলেছেন, বিছানাটা নষ্ট করেছেন।'

দীনুবাবু কথাটা শুনে উত্তর দিলেন—আমি বেনের ছেলে, বেনের ছেলের হাত দিয়ে জল গলে না, একাজ আমার দ্বারা হয়নি।

নকুড়বাবু হাসতে লাগলেন।

*

একবার দীনুবাবু বাজার থেকে না চেখে বা না খেয়ে বেশি দাম দিয়ে আম কিনে আনেন। তাঁর স্ত্রী কয়েকবার তাকে বললেন—না চেখে আম আনো, সব টক জোঁদা। আমরা বাড়িতে কিনি তাও চেখে নি।

এর কয়েকদিন পরে এক বুড়ি দীনুবাবুর বাড়িতে ঝাঁটা বেচতে এল। তিনি বুড়িকে বাড়ির ভেতরে ডেকে এনে স্ত্রীকে বললেন—আমি না খেয়ে কিনে এনে ঠকেছিলাম, তুমি এখন এটা খেয়ে নাও।

*

পুলিশ আদালতে কার্যকালে কোন কোন সময় মধুসূদন চোপা-চাপকান পরতেন। একবার শালের পাগড়ি ও চোপা-চাপকান পরে শালের রুমাল হাতে নিয়ে বেরোবার উদ্যোগ করছেন—এমন সময় দীননাথ ধর এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই হাসতে হাসতে বললেন—Dinoo, do I look like the Maharaja of Burdwan.

*

আর একদিন দীননাথকে বললেন—লও হে, একপাত্র টেনে নাও।

দীননাথ খেতে অসম্মত হওয়ায় তিনি আদর করে তাঁর পিঠ চাপড়ে Elihu Barret-এর কবিতা আবৃত্তি করে বললেন—Touch not, taste not, smell not, drink not any thing that intoxicates.

পরক্ষণে গ্লাসের দিকে চেয়ে সেক্সপীয়ারের অংশ আবৃত্তি করে বললেন—

"Oh ! Thou invisible Sprit of Wine
If thou hast no name to be known by.
Let us call thee—Devil"……

*

মাদ্রাজের এক হিমস্নিগ্ধ জলে স্নান করে মধুসূদনের মধুময় কণ্ঠস্বর চিরদিনের জন্য ভগ্ন ও বিকৃত হয়ে যায়। মাইকেল দেখতে কালো, তদুপরি হলো গলাটা ভাঙা। কোনও এক সুদর্শন লোক মাইকেলের চেহারা আর গলার আওয়াজ নিয়ে কটাক্ষ করে। তাই শুনে মাইকেল হেসে বলেন—

"তবুও আমি গলা ভাঙা কোকিল।
সাদা হাঁসের মতো করি না ত প্যাঁক প্যাঁক প্যাঁক।"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঢাকায় গেলে সেখানকার জনকয়েক যুবক তাঁকে একখানি অ্যাড্রেস দেন। তখন একজন বক্তৃতাকালীন বলেন যে “আপনার বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি দ্বারা আমরা যেমন মহাগৌরবান্বিত হই, তেমনি আপনি ইংরাজ হইয়া গিয়াছেন শুনিয়া আমরা ভারি দুঃখিত হই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলাপ ব্যবহার করিয়া আমাদের সে ভ্রম গেল।”

মাইকেল উত্তরে বলেন—“আমার সম্বন্ধে আপনাদের আর যে কোন ভ্রমই হউক, আমি সাহেব হইয়াছি এ ভ্রমটি হওয়া ভারি অন্যায়। আমার সাহেব হইবার পথ বিধাতা রোধ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আমার বসিবার ও শয়ন করিবার ঘরে এক-একখানি আর্শি রাখিয়া দিয়াছি। এবং আমার মনে সাহেব হইবার ইচ্ছা যখন বলবৎ হয় অমনি আর্শিতে মুখ দেখি। আরো, আমি শুদ্ধ বাঙ্গালি নহি, আমি বাঙ্গাল আমার বাটি যশোহর।”

॥ তিন ॥

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। যদিও দীনবন্ধু ছিলেন বঙ্কিমের চেয়ে বয়সে বেশ কিছু বড়।

একদিন কাঁঠালপাড়ায় দীনবন্ধু গেছেন বঙ্কিমের বাড়ি, প্রায়ই যেতেন। বৈঠকখানায় দেখেন বঙ্কিম কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বৈঠক বসিয়েছেন। দীনবন্ধুর আগমনে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল। আসর জমবে ভালো। কেবল বঙ্কিম দীনবন্ধুকে অভ্যর্থনা করলেন না।

খাবার সময় হল তখনও বঙ্কিম তাঁর সঙ্গে কথা বললেন না। ব্যাপার কি? কি হল, বন্ধু-বিচ্ছেদ নাকি? অভিন্ন বন্ধুর মধ্যে। দীনবন্ধু বঙ্কিমের ব্যাপার লক্ষ্য করে বঙ্কিমের পড়ার ঘরে গিয়ে এক টুকরা কাগজ নিয়ে একটা ছবি এঁকে তার তলায় দু লাইন কবিতা লিখলেন।

ছবি দেখে সকলেই হাসাহাসি করতে লাগলেন, কেবল বঙ্কিম ছাড়া। বুঝলেন এ হাসি তাঁকে উপলক্ষ্য করে।

তিনিও তখন পড়ার ঘরে গিয়ে একটা কাগজের ওপর কি লিখলেন, তারপর গঁদ দিয়ে দীনবন্ধুর অজান্তে সেই কাগজটা তাঁর পিঠে সেঁটে দিলেন। তাই দেখে আবার সকলে হাসতে লাগলেন। এবার দীনবন্ধু বুঝলেন ব্যাপারটা তাঁকে নিয়েই।

দীনবন্ধু তখন অপ্রতিভ না হয়ে বলতে লাগলেন—তোমরা কেউ আমায় বলে দাও না গো, আমার পিঠে কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ, তাই তার পিঠে কোথায় মশাটা, মাছিটা বসেছে—তা সে দেখতে পায় না।

বঙ্কিম গম্ভীর ভাবে বললেন—দেখতে পায় না বলেই তো আমরা তাকে হস্তীমূর্খ বলি।

এবার সকলেরই হাসির পালা।

*

দীনবন্ধু যখন সরকারী সুপারনিউমারি ইনসপেকটিং পোস্টমাস্টার ছিলেন, তখন একবার কাছাড়ে গিয়ে ডাকের বন্দোবস্ত করে ফিরে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন সেখানকার কয়েক জোড়া কাপড়ের জুতো।

দীনবন্ধু লোক মারফৎ একজোড়া জুতো বঙ্কিমকে পাঠিয়ে দেন, সংগে একখানা কাগজ, তাতে লেখা—'কেমন জুতো'?

বঙ্কিম বন্ধুর লেখা পড়ে হাসলেন ও সেই লোক মারফৎ লিখে পাঠালেন —'তোমার মুখের মতো'।

*

বঙ্কিম বারুইপুরে বদলী হবার পর মাঝে মাঝে দীনবন্ধু মিত্তির ও জগদীশচন্দ্র রায় (২৪-পরগণার এসিস্টেন্ট ডিস্ট্রিক্ট সুপারিনটেনডেন্ট) বঙ্কিমের বাড়িতে আসতেন ও কয়েকদিন আমোদ-আহ্লাদ করে চলে যেতেন। একদিন মজিলপুরে অবস্থিতিতে এঁরা দুজন রাত সাড়ে আটটায় মজিলপুরে এসে হাজির। বঙ্কিম তখন পড়াশোনা করছিলেন। তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির সামনে এসে গান ধরলেন– 'আমরা বাগবাজারের মেথরানী গো'। বঙ্কিম তাঁদের কণ্ঠস্বর চিনতে পেরেই বারান্দায় এসে চেঁচিয়ে বললেন—কালুয়া নিকাল দেও, কালুয়া নিকাল দেও।

এইরূপ সম্ভাষিত হয়ে বাবুদ্বয় বাড়ির ভেতর প্রবেশ করলেন।

*

বঙ্কিমবাবু অবসর গ্রহণের পর কলকাতায় প্রতাপ চ্যাটার্জি লেনে নিজ বাড়িতে কিছু কাল ছিলেন। সেই বাড়িতে একবার তিনি খালি গায়ে ভেতরের রোয়াকে বসে তেল মাখছিলেন। এমন সময় দীনবন্ধু মিত্তির এসে হাজির। দীনবন্ধুর হঠাৎ নজর পড়ল দ্বিতলের ঘরের জানালায় বঙ্কিম-গৃহিণী দাঁড়িয়ে আছেন। তৎক্ষণাৎ সেই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—ওহো, এখানে কি চাঁদের শোভা।

বঙ্কিম ওপরের দিকে একবার চেয়েই উত্তর দিলেন—আহা, যেন দিনের (দীনবন্ধুর) গালে হেগে দিয়েছে।

বঙ্কিম এরকম পালটাপালটি জবাব দিতে খুবই পটু ছিলেন।

*

সাহিত্যরসিক দামোদর মুখুজ্যে বঙ্কিমের সম্পর্কিত বেহাই। তাঁর বাড়িতে উৎসব। আসর জমকালো। নানা গুণী মহারথীরা হুঁকো হাতে তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আসর আলো করে বসেছেন। এমন সময় বঙ্কিমচন্দ্রকে আসতে দেখে বেহাইয়ের সাদর আহ্বান—এসো এসো বঙ্কিম চট্টো (অর্থাৎ বাঁকা চটিজুতো)।

বঙ্কিমও রসজ্ঞ, প্রত্যুত্তর দিতে ছাড়লেন না, বললেন—কোন দিকে হে, দামোদর মুখোয় (অর্থাৎ দামোদরের মুখে)।

*

দামোদরবাবু 'শান্তি' নামে একখানি উপন্যাস প্রকাশ করে বঙ্কিমকে সাদরে উপহার দেন। বঙ্কিম উপহার পেয়ে লিখলেন—

প্রিয়তমেষু, 'শান্তি' প্রাপ্ত হইলাম। ইহলোকে পাইলাম, পরলোকেও ভরসা করি দামোদর বঞ্চিত করিবেন না। ইতি—

তাং ২২শে আশ্বিন।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

*

আবার দামোদর বঙ্কিমের কয়েকটি উপন্যাসের উপসংহার লেখেন—উপসংহারগুলি তেমন সুবিধের হয়নি। তাই তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন—'আপনি আমার উপন্যাসের উপসংহার লিখে আমাকে সংহার করেছেন।'

*

সদরালা দিগম্বর বিশ্বাসের বাড়িতে এক সময়ে তাঁর স্ত্রীর সাবিত্রী-ব্রতোপলক্ষে বঙ্কিমবাবু ও তাঁর ভাইদের ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ হয়। বঙ্কিমবাবু ও তাঁর দুভাই নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যান। ভোজনান্তে দক্ষিণা নেবার সময় তিনি দুহাত বাড়ালেন। দিগম্বরবাবু বললেন—কি তুমি দুহাতে দক্ষিণা নেবে নাকি?

বঙ্কিমবাবু—না নিলে চলবে কেন ভাই। গাড়িভাড়া এক টাকা। তিন ভাইয়ের রোজগার দেখছি, মাত্র বারো আনা, বাকী চার আনা আমি পকেট থেকে দেবো না কি?

উপস্থিতদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা ছুটল।

*

বঙ্কিম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন।

একবার কোনও এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির নামে আদালতে নালিশ করে যে, সে তাঁর স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে। বঙ্কিমের এজলাসে সেই মামলা ওঠে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—সাক্ষী আছে?

প্রথম ব্যক্তি বললে—হুজুর আমার স্ত্রী-ই সাক্ষী, সেই দেখেছে।

বঙ্কিম সহাস্যে বললেন—তা হলে দেখা যাচ্ছে যে তোমার স্ত্রীরও পরপুরুষের প্রতি কটাক্ষপাত করা অভ্যাস আছে, নতুবা তিনি কেমন করে জানলেন যে, এই ব্যক্তি তাঁর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছে?

*

আর একবার আদালতে বঙ্কিমের এজলাসে এক ব্যক্তি নালিশ করে যে সামনের বাড়ির একটি লোক জানালা খুলে তার স্ত্রীকে রোজ দেখে।

বঙ্কিমবাবু রসিকতা করে বললেন, হাওয়া আর চোখ কি কারুর বাধা মানে গা?

মামলা মিটিয়ে দিলেন।

*

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র সস্ত্রীক ট্রেনে ভ্রমণ করছিলেন। শোনা যায় বঙ্কিম-গৃহিণী বেশ সুন্দরী ছিলেন। প্রতি স্টেশনে দেখা গেল এক কোঁকড়ানো চুলওয়ালা কৃষ্ণকায় যুবক গাড়ি থামলে তাঁর কামরার দিকে এসে ঘুরে ফিরে তাঁর স্ত্রীর দিকে দেখছিল।

এবার যখন সেই যুবক তাঁর কামরার কাছে এসেছে—বঙ্কিম সেই যুবকের দিকে আঙুল দেখিয়ে স্ত্রীকে বললেন—দেখছ, ঠিক যেন চিংড়িতনের টেক্কা।

কথাটি যুবকের উদ্দেশ্যে বলা হয় ও যুবকও শুনতে পায়। যুবকটি কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে—আপনার কাছে রঙের বিবি আছে, তুরুপ করে নিন না।

তার উপস্থিত জবাবে বঙ্কিম খুসী হয়ে তাকে ডেকে কিছুক্ষণ বসালাপ করলেন।

*

আর একদিন সস্ত্রীক ট্রেনে যাচ্ছিলেন সেবারেও এক যুবক স্টেশনে ঘুরে ঘুরে তাঁর স্ত্রীকে দেখছিল।

বার বার ওরূপ হওয়াতে বংকিম তাকে গাড়ির ভেতর ডেকে বসালেন। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি কর?

যুবক—চাকরী করি।

বংকিম—কত মাইনে পাও?

যুবক—ত্রিশ টাকা।

বংকিম—বেশ, তুমি এই স্ত্রীলোকটিকে দেখার জন্য ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছ—আমি ঘোমটা খুলে দিচ্ছি, ভালো করে দেখ। আর শোন—আমি ডেপুটিগিরি করি, মাইনে পাই আটশ টাকা, নাম আমার বংকিম চাটুজ্যে, বই লিখি তাতেও বেশ হয়। সর্বসাকুল্যে আমার আয় হাজার দেড় দুয়েক। সে সবই এঁর শ্রীচরণে দিয়েও মন পাইনে, আর তুমি বাবু ত্রিশ টাকার কেরানী, একবার চেষ্টা করে দেখ, মন পাও কি না?

যুবকটি লজ্জায় মাথা হেঁট করে চলে গেল।

*

একদিন কৈকালার চন্দ্রনাথ বসুর সংগে বসে বঙ্কিমচন্দ্র গল্প করছিলেন। এমন সময় সেখানে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় এসে হাজির। ইতিপূর্বে চন্দ্রনাথবাবুর সংগে চন্দ্রশেখরবাবুর আলাপ ছিল না। বঙ্কিম চন্দ্রশেখরবাবুকে দেখিয়ে চন্দ্রনাথকে বললেন—এঁকে চেন না?

চন্দ্রনাথ—না।

বঙ্কিম—উনি 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'।

(বলাবাহুল্য সাহিত্যজগতে বিখ্যাত বই 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম'-এর রচয়িতা চন্দ্রশেখরবাবু)

*

নানা লোকে বলত বঙ্কিমচন্দ্র দেমাকী।

অক্ষয় সরকারও তাঁকে দেমাকী বলে টিটকারী দিতেন। তাই শুনে একদিন বঙ্কিম বললেন—এক গুলির আড্ডায় আমার বইয়ের সমালোচনা হচ্ছিল। তাদের ধারণা বঙ্কিমটা নিশ্চয়ই গুলি খায়, তা নইলে এমন রসিকতা কি আর তার হাত দিয়ে বের হয়?

অক্ষয়চন্দ্র বুঝলেন তাঁকেই উদ্দেশ করে এ কথা বলা হল। তাই হেসেই বললেন—আমি গুলিখোর হই আর যাই হই—কিন্তু আপনাদের দেমাকে দেশের মাটি কম্পমান।

বঙ্কিম নবীন সেনকে বললেন—কথাটা ঠিক। বহরমপুরে বদলি হয়ে

গেছি—অফিসের কাজের পর বাড়িতে এসে লেখাপড়ার সুযোগ পেতুম না। বাড়িতে সব সময় দর্শকদের ভীড়, তাদের জ্বালায় অস্থির। যে আসে সে হুঁকো নিয়ে বসে লেখার দফাটি মাটি করে দেয়। কাজেই বাড়ির দরজায় এক নোটিশ টাঙিয়ে দিলুম—কেউ আমার সাক্ষাৎ পাবেনা।

তারপর দিন থেকে সমস্ত বহরমপুরে আমার দেমাকী নাম ছড়িয়ে পড়ল। কেউ আর বাড়িতে আসতো না।

*

অক্ষয় সরকার 'সাধারণী' নামে এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন, তাই বঙ্কিম অক্ষয়-গৃহিণীর নাম দেন 'অসাধারণী'।

একদিন অক্ষয় সরকার আর হাইকোর্টের জজ দ্বারকা মিত্তির চুঁচুড়ার গংগায় নৌকা ভ্রমণ করতে করতে ওপারে নৈহাটির ঘাটের কাছে এসে পড়লেন। তখন নদীর মাঝ থেকে এক দুপদুপ আওয়াজ শোনা গেল। সম্ভবত অন্য কোনও নৌকোয় শক্ত জিনিসের ওপর ঠোকাঠুকি হচ্ছিল। অনেকেই এদিক-ওদিক চেয়েই ভাবছিল এই দুপদুপ আওয়াজটা কোত্থেকে আসে।

দ্বারকানাথ গম্ভীর ভাবে বললেন—এ শব্দটা কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারলেন না? এপারে কাঁঠালপাড়া, নদীর ধার দিয়ে চার ডেপুটি এক সংগে গটমট করে চলেছে, তারই আওয়াজ। প্রসংগত বঙ্কিমরা চার ভাই-ই ডেপুটি ছিলেন।

*

একবার রামতনু লাহিড়ী বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে দেখা করতে আসেন। তাঁর ছেলে শরৎকুমার একজন পুস্তক-ব্যবসায়ী। শরৎকুমারের ইচ্ছা বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি হাফটোন ছবি প্রকাশ করেন। এদেশে তখন হাফটোন ছবির ব্লক হত না, বিলেত থেকে আনাতে হত। শরৎকুমার নিজব্যয়ে তাই করতে ইচ্ছে করে তাঁর পিতাকে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পাঠান। বঙ্কিম ছবি ছাপাতে সম্মত হলেন না। বৃদ্ধ রামতনু তবুও বসে আছেন দেখে বললেন—আমি বিবেচনা করে দেখব, পরে আপনার ছেলে শরৎকে জানাব। বৃদ্ধ চলে গেলেন।

কয়েকদিন পরে বঙ্কিমচন্দ্র শরৎবাবুকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে উপস্থিত। বঙ্কিম তাঁকে চিনতেন না। জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? শরৎ উত্তর দিলেন--আমার নাম এস কে লাহিড়ী।

বঙ্কিম—আপনার প্রয়োজন?

শরৎ—আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

বঙ্কিম—আমি কোন এস কে লাহিড়ীকে চিনি না, তাকে ডেকে পাঠাইও নি ?

শরৎবাবু অপ্রতিভ হয়ে তখন তাঁর পিতার নাম বললেন।

তখন বঙ্কিম হেসে বললেন—তা হলে তুমি শরৎকুমার। আমি এস কে লাহিড়ীকে কেমন করে চিনবো !

*

আর একবার বিলেত ফেরৎ এক বাঙালী সাহেব বঙ্কিমচন্দ্রকে একখানি চিঠি লেখেন—তার ওপর মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তার উত্তর দিলেন—এ বাড়িতে মিস্টার বঙ্কিমচন্দ্র বলে কোন লোক নেই, তুমি বোধ হয় ভুল করেছ।

*

তদানীন্তন ছোটলাট স্যর এসলে ইডেন বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু স্নেহ করতেন। এক সময়ে কথা প্রসংগে বললেন—বঙ্কিমবাবু তোমার পিতা আজও জীবিত আছেন ?

বঙ্কিম—আছেন।

ইডেন—কতদিন পেন্সন ভোগ করছেন ?

বঙ্কিম—২৫ বছরের কম হবে না।

বঙ্গেশ্বর হাসতে হাসতে বললেন—দেখ বঙ্কিমবাবু, ২৫ বছর চাকরী করলে আমরা পেন্সন দিয়ে থাকি, তোমার পিতা ২৫ বছর পেন্সন পাচ্ছেন, তাঁকে পেন্সনের পেন্সন দেওয়া উচিত, কি বল ?

বঙ্কিমবাবু হাসতে লাগলেন।

*

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাই সঞ্জীববাবু তখন প্রবেশনারি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ হলেই তিনি পাকা হতে পারেন। ১৮৮৪ সালে ডিস্ট্রিক্ট টাউন্স এক্ট পাশ হয়। সঞ্জীববাবু ও জজ সাহেবরা কমিশনার হলেন। একদিন কমিটিতে কথা উঠল—রাস্তার নাম দিতে হবে, টিনের ওপর নাম লিখে রাস্তায় রাস্তায় দেওয়া হবে। ঠিক হল ৩০০ টাকা মঞ্জুর করতে হবে। জজ সাহেব বললেন—আরও ৭৫ টাকা চাই, কারণ বাংলায় নামগুলো কে বুঝবে ? ওগুলো ইংরেজিতে তর্জমা করে দিতে হবে। 'বৌমার গলি' বললে কেউ বুঝবে না, daughter in law's lane বলতে হবে। সঞ্জীববাবু বললেন—৭৫ টাকায় হবে না, আরও ৩০০ টাকা দেওয়া হোক। জজ সাহেব উৎফুল্ল হয়ে বললেন—কেন, কেন ?

সঞ্জীববাবু বললেন—আদালতের সম্পর্কে যত লোক আছে, সকলের নামই

তর্জমা করতে হবে। মনে করুন—কালিপদ মিত্র বলে একজন হাকিম আছেন। কালিপদ মিত্র বললে কে চিনবে? তাঁকে black-footed friend বলে তর্জমা করতে হবে। সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন। জজ সাহেবের মুখ লাল হয়ে গেল। জজ সাহেব তখনই টুপি নিয়ে কমিটি থেকে উঠে গেলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন— সঞ্জীব, ভালো করলে না। বাড়ি গিয়ে ওকে ঠান্ডা করে এস। সঞ্জীববাবু তিন দিন গেলেন, সাহেবের দেখা পেলেন না। হপ্তাখানেক পরে খবর এল—জজ সাহেব সেক্রেটারি হয়ে গেছেন। সঞ্জীববাবু তিনবার পরীক্ষা দিয়েও পাশ করতে পারলেন না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের তালিকা থেকে সেবার তাঁর নাম কাটা গেল।

রসিকতার ফল ফলল।

*

একদিন চুঁচুড়োয় ভূদেববাবুর বাড়িতে বঙ্কিম ও ভূদেব উভয়েই কথায় ব্যস্ত। এমন সময় বাঁশবেড়ের (বংশবাটি) জমীদার রায় বাহাদুর ললিতমোহন সিংহ ও তাঁর সংগে পণ্ডিত মহেশ ন্যায়রত্ন এসে হাজির। বঙ্কিমের সংগে ন্যায়রত্নের আলাপ ছিল না। ভূদেবের সংগে ছিল। ভূদেব তাঁকে দেখেই জিজ্ঞেস করলেন— কোথায় বুঝি শ্রাদ্ধে উপস্থিত হয়েছ? তাই বিদায় মাগতে এসেছ?

উত্তরে ন্যায়রত্ন বললেন—না, না, ললিতবাবুর কাছে একটা বৈষয়িক কাজে এসেছি।

যদিও কথাটা সত্যি, কিন্তু ললিতবাবু তামাসা করবার জন্য বললেন বটে, এখনি বামাল ধরিয়ে দেব, গাড়িতে কলসী এখনও মজুত আছে।

বাস্তবিক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গাড়িতে তাঁর একটা নতুন পেতলের কলসী ছিল।

বঙ্কিমবাবু আর থাকতে পারলেন না, বললেন—অধ্যাপক মশাই, আপনি এখনও যদি শ্রাদ্ধে বিদায়ের কলসী গ্রহণ করেন, তবে সেই সংগে এক গাছি দড়িও নেবেন। এই দড়ি-কলসী নিয়েই তাঁদের সংগে আলাপের সূত্রপাত হয়।

*

কবি নবীন সেনের সংগেও এরূপভাবে প্রথম আলাপ হয়েছিল।

কবি নবীনচন্দ্র নৈহাটিতে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের সংগে আলাপ করতে। সংগে আছেন অক্ষয় সরকার। তিনিই পরিচয় করিয়ে দেবেন। বৈঠকখানায় দুজনে বসে আছেন বঙ্কিমের অপেক্ষায়। ঘরে বসেছিলেন বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র। নানা বিষয়ে আলাপ চলছে—এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে একজন

এসে নবীনচন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীনচন্দ্র চমকে উঠে দেখেন এক দিব্যকান্তি সুপুরুষ তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। সঞ্জীব বললেন—কে বলুন তো লোকটা ?

নবীন সেন হেসে প্রণাম করতে যাচ্ছিলেন। প্রণাম করা হল না—ভদ্রলোক নবীনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন—আমি কে ?

নবীনচন্দ্র হেসে বললেন—বঙ্কিমবাবু।

—কি করে চিনলেন ?

—শিকারী বেড়ালের গোঁপ দেখে চেনা যায়।

—বটে আমার গোঁপের ওপর আপনার নজর পড়েছে।

– পড়বার কথা নয় কি ?

এবার সকলে হাসাহাসি করতে লাগলেন।

*

ছাত্রাবস্থায় তিন সাহিত্যিক 'কবির লড়াই' করতেন। দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ও দ্বারিকানাথ অধিকারী। দীনবন্ধু কলকাতায় হিন্দু কলেজে, বঙ্কিম হুগলী কলেজে আর দ্বারিকানাথ কৃষ্ণনগর কলেজে। তাই দীনবন্ধুর নাম 'শহুরে কবি', বঙ্কিমের 'চট্টো কবি,' আর দ্বারিকানাথের 'বুনো কবি,'। কিছুদিন পরে কবির লড়াই শেষ হলে দ্বারিকানাথ কবিতা ছেড়ে গদ্যে লিখলেন—'হে মিত্র, বারংবার এরূপ চিত্র করিয়া আর স্বীয় কলেজের সুখ্যাতি বিস্তার করিবেন না।'

দীনবন্ধু তার উত্তর দিলেন—আমাদিগের বুনো কবিটি···চপল। দ্বারিকাবাবু আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়বেন—

'দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্বং যাতি কোকিলঃ
পীত্বা কর্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে।'

(কোকিল দিব্য আম্রফল ভক্ষণ করতে গর্বিত হয় না কিন্তু ভেক কর্দমযুক্ত জল পান করে গর্বে মকমক শব্দ করতে থাকে।)

*

বঙ্কিম খুলনায় বদলি হলে একদিন তাঁর বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্তির, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, শচীশ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বসে আছেন—এমন সময়ে বঙ্কিম তাঁদের কাছে প্রশ্ন করলেন—যদি ছোটবেলা থেকে ষোলো বছর পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনের মধ্যে কোনও কাপালিকের দ্বারা পালিত হয়, কাপালিক ভিন্ন অন্য কোনও লোকের মুখ দেখতে না পায়, সমাজের কিছু না জানতে পারে, দৈবক্রমে যদি তাকে কেউ বিয়ে করে নিয়ে আসে, তবে সমাজ-

সংসর্গে তার কি পরিবর্তন হবে, কাপালিকের প্রভাব কি তার ওপর থেকে চলে যাবে ?

সঞ্জীবচন্দ্র রসিক লোক ছিলেন—তিনি বললেন—যদি দরিদ্র ঘরে বিয়ে হয়, তা হলে মেয়েটা চোর হবে, বনজংগলে ভালো খেতে পেত না, সমাজে এসে ভালো খাবার দেখে লোভ হবে, দরিদ্র ঘরে আহার জুটবে না, পরের ঘরে চুরি করে খাবে, গয়নাপত্তরও চুরি করতে পারে সাজ-পোষাক করবার জন্য ইত্যাদি। পরে তিনি ব্যংগ ত্যাগ করে অন্য কথাও বলেছিলেন।

বঙ্কিমের এ উত্তর মনোপূত হয় নি।

এর পরে কপালকুণ্ডলার জন্ম হয়।

*

পরিহাসপ্রিয় দীনবন্ধু মিত্র একবার পাল্কী করে মফঃস্বলে পরিদর্শন করতে গেছেন। দুপুর বেলায় এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে দেখলেন, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে মহাধুমধাম। ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যাপারের অনুষ্ঠান চলছে। সকাল থেকে এতটা পথ এসে তাঁর খুবই খিদে পেয়েছিল। তিনি পাল্কী থেকে দেখলেন নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ চণ্ডীমণ্ডপে বসে আছেন। দীনবন্ধু এই বাড়ির কাছে এসেই বেয়ারাগণকে পাল্কী নামাতে বললেন। তিনি পাল্কী থেকে নেমেই সোজাসুজি চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হয়ে এক ধারে বসলেন আর বেয়ারাদের বললেন—আমার বাক্স ও কাগজপত্র এখানে দিয়ে যাও। বেয়ারারা তাই করলে। দীনবন্ধু চণ্ডীমণ্ডপে বসে সেই কাগজপত্র দেখা, লেখাপড়া করতে লাগলেন। কারুর সংগে কোনও কথাটি নেই। সমাগত লোকেরা বিস্মিত। সকলেরই ধারণা ইনি একজন কেউ-কেটা লোক। ভয়ে কেউ আর তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করলেন না। ব্রাহ্মণ-ভোজনের সময় এল, ব্রাহ্মণগণ উঠলেন। দীনবন্ধুও উঠলেন। ব্রাহ্মণদের সংগে পাতে বসলেন। সকলেই অবাক্। গৃহস্বামী এসে বিনয় বচনে তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। যখন জানতে পারলেন ইনিই দীনবন্ধু, তখন আর আনন্দের সীমা রইল না। কৌতুক করে ভুরিভোজের ব্যবস্থা পাকা করলেন।

*

দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি কৌতুক কাহিনী।

একবার কর্মোপলক্ষে মফঃস্বলে গেছেন। কাজ সেরে স্টেশনে এসেছেন। গাড়ি আসতে দেরী আছে। কি করবেন। তখন তিনি পোস্টাল ইন্সপেক্টর। সুতরাং তারবাবুর অফিসেই ঢুকলেন। তারবাবু দীনবন্ধুকে চিনতেন না। আগে দেখেন নি।

দরজায় 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা সত্ত্বেও দীনবন্ধুকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখে রুক্ষস্বরে তারবাবু বললেন—কে তুমি? কি চাও?

দীনবন্ধু—আমি দীনবন্ধু, দেখতে পারছ না?

তারবাবু বললেন—দেখতে পাচ্ছি, বে-আক্কেলে মানুষ, দরজায় কি লেখা আছে দেখেছ?

দীনবন্ধু—হুঁ দেখেছি, তাতে হয়েছে কি?

তারবাবু—বেরিয়ে যাও, এখানে ঢুকলে শাস্তি পাবে। দীনবন্ধু চেয়ারে বসলেন।

তারবাবু তখন চেঁচিয়ে চাপরাশিকে ডেকে তাঁকে ঘর থেকে বার করে দিতে বললেন।

চাপরাশি বের করে দেবে কি, বাবুর মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

দীনবন্ধু বললেন—ওর কম্ম নয়, পার তো তুমি এসে ঘাড় ধরে বের করে দাও। তোমার বড় ঝাঁজ দেখছি। যত সব মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো ছেলেরা তারের কাজে আসে। এখন বের করে দেবার জন্য বাহাদুরী দেখাচ্ছ, আমার নাম শুনলে চক্ষুস্থির হয়ে যাবে। আমি খানকতক বই লিখেছি, তাই পড়ে রসিকতা শিখেছ—এখন নামটা শুনবে? শুনলে—হাত-মুখ ধোবার জল আনবে, তামাক সাজবে, পান এনে খাতির করবে। বুঝলে?

এসব কথা শুনলে সকলেরই রাগ হয়। তারবাবুরও রাগ হল। তখন একটু ভদ্রস্থ হয়ে বললেন—আপনি বাইরে যাবেন কি না?

দীনবন্ধু—বলি দীনবন্ধু মিত্তিরকে বসতে বলবে, না, তাড়াবে?

নাম শুনে তারবাবুর রাগ জল হয়ে গেল। রাগের বদলে এবার ভয় দেখা দিল। ভয়ে ভয়ে তারবাবু বললেন—আপনি আগে আপনার নামটা বললেই পারতেন।

তারবাবু তখন নিজেই ছুটে গিয়ে তামাক সেজে হাতে নিয়ে দীনবন্ধুর হাতে দিতে গেলেন—

দীনবন্ধু তখন গম্ভীর ভাবে বললেন—কল্কেটা ফুঁ দিয়ে ধরাও।

*

১৮৭২ সালে ৩০-এ মার্চ চুঁচড়োয় দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটক অভিনীত হল। এই অভিনয়ের উদ্যোক্তা ছিলেন দুজন—বঙ্কিম ও অক্ষয় সরকার।

অভিনয়ের জন্য 'লীলাবতী' নাটকের কিছু কিছু অংশ কাটাছেঁড়া করতে হয়েছিল এবং সেটা করে ছিলেন বঙ্কিম ও অক্ষয়চন্দ্র। তা নিয়ে দীনবন্ধু

বলেছিলেন— এক-একটা শব্দ কাটা হয়েছে, আর আমার শরীর থেকে রক্তপাত হয়েছে। তবে বঙ্কিম হলো ভাই, আর অক্ষয় হলো ছেলে, তাদের আমি ভালোবাসি বলে, আমার শরীরে জ্বালা লাগে নি।

চুঁচড়োয় অভিনয়ের খুব সুখ্যাতি হল।

*

বাগবাজারের দল চুঁচড়োর দলের কাছে হেরে যাবে। দীনবন্ধু এসে অর্ধেন্দুশেখরকে বললেন—তোমরা পারবে না চুঁচড়োকে ডাউন করতে।

অর্ধেন্দু চলল গিরিশ ঘোষের কাছে। গিয়ে বললেন—তুমি বসে বসে দেখবে যে চুঁচড়োর দলের কাছে আমরা হেরে যাব?

বাগবাজারের দল অভিনয় করল। খুব সুন্দর অভিনয়। এই অভিনয়ের সঙ্গে চুঁচড়োর দলের কোনও তুলনা হয় না। দীনবন্ধু বললেন—আমি চিঠি লিখব—'দুয়ো বঙ্কিম'।

*

দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী' অভিনয় হচ্ছে রায় রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়িতে ১৮৭০ সালে। দীনবন্ধু মিত্র এই অভিনয় দেখতে এসে ছিলেন। সেদিন নিমচাঁদের ভূমিকায় সেজেছিলেন—গিরিশ ঘোষ, অটলের ভূমিকায় নগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী ইত্যাদি। সেদিন সকলের অভিনয় খুবই সুন্দর হয়েছিল। নাটক ছাড়াও সেদিন এক কাণ্ড করে বসে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর। নাটকে অটলকে লাথি মারার কোনও কথা নেই—কিন্তু জীবনচন্দ্ররূপী অর্ধেন্দুশেখর অটলকে লাথি মেরে চলে গেলেন।

অভিনয় শেষ হলে—অর্ধেন্দুকে ডেকে দীনবন্ধু বললেন—ও, improvement on the author হয়েছে। আমি এবার 'সধবার একাদশী'র নতুন সংস্করণে লিখে দেব 'অটলকে লাথি মেরে গমন'।

*

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছেন বেনেটোলায় ডেপুটি অধর সেনের (ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট) বাড়িতে। বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক দিনের সাধ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার। এই সুযোগে তিনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। অধর সেন রামকৃষ্ণের সঙ্গে বঙ্কিমের পরিচয় করিয়ে দিলেন—ইনি বঙ্কিম চাটুজ্যে। অনেক বই লিখেছেন, বিখ্যাত সাহিত্যিক, আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মৃদু হেসে বললেন—বঙ্কিম, কার হাতে পড়ে বেঁকলে গা?

বঙ্কিমও হেসে বললেন—হাতে নয়, বেঁকেছি ইংরেজের বুটের ঠোক্করে।

*

অক্ষয় সরকার যখন বহরমপুরে ওকালতী সুরু করেন, তখন বহরমপুরে অনেক জ্ঞানি-গুণি ব্যক্তিরও কর্মস্থল ছিল, যেমন—বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রামগতি ন্যায়রত্ন, লোহারাম শিরোমণি, গঙ্গাচরণ সরকার প্রভৃতি। এই সব সাহিত্যিকরা মিলে এক নবরত্ন সভা স্থাপন করেন। বিক্রমাদিত্য হন—জজসাহেবের সেরেস্তাদার বৈকুণ্ঠনাথ নাগ, তাঁরই সেরেস্তার ঘরে সভা বসত, জজসাহেব এলেই সভা ভেঙে যেত। শ্যামাচরণ ভট্ট—বেতাল ভট্ট। বৈকুণ্ঠনাথ সেন—ধন্বন্তরি, সরকারী উকীল দীননাথ গাঙ্গুলি—ক্ষপণক, খ্যাতিমান গুরুদাস—বররুচি, গঙ্গাচরণ সরকার—কালিদাস—আর অক্ষয় সরকার—রাক্ষস (বিরোধী পক্ষ)। বররুচি আলংকারিক ছিলেন—বললেন—মাইকেলের অনুপ্রাস বড়ই মিষ্টি, যেমন—"কিম্বা বিম্বাধরা রমা অম্বুরাশি তলে"।

অক্ষয় সরকার বললেন—এ রকম অনুপ্রাস মুখে মুখে করা যায়—

তিনি বললেন—করুন।

অক্ষয়বাবু সংগে সংগে বললেন—"কানচেন রাঘব বাঞ্ছা গামচা আনচে কেষ্টা"।

আর একদিন সভায়—বররুচি কালিদাসকে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন কি জিনিস আছে যা থাকা ভালো কিন্তু পাওয়া মন্দ, কালিদাস উত্তর দিলেন—কৃষ্ণ। থাকা ভালো—কিন্তু কৃষ্ণপ্রাপ্তি মন্দ।

*

ঢাকায় অবস্থান কালে একদিন অক্ষয় সরকার পিতা গঙ্গাচরণের সংগে 'মেঘনাদবধ' নাটক দেখতে গেছলেন। মেঘনাদ বধ হয়েছে, প্রমীলা সহগামিনী, রাবণ স্পীচ দিয়ে চলে গেছেন, জনপ্রাণী নেই—প্রমীলা বেচারা নিজেই নিজের চিতা ফুঁ দিয়ে জ্বালাচেছন। এই দৃশ্য দেখে অক্ষয়বাবু বলে উঠলেন—এদের কি কেউ নেই নাকি, ভৃত্য পরিচারকরা সব গেল কোথায় ?

পিতা গঙ্গাচরণ বললেন—'রাম কি আর কিছু রেখেছে গা, রাক্ষসপুরী শূন্য করেছে ?'

॥ চার ॥

'আলালের ঘরের দুলাল'-প্রণেতা প্যারীচাঁদ মিত্র সেকালে এক বিশিষ্ট লোক ছিলেন। শিক্ষিত সমাজে ও ইংরেজ মহলে তাঁর প্রতিপত্তি খুবই ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগও ছিল।

একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও সভায় এক প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছিল। তখন প্যারীবাবু সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

কিছুক্ষণ পরে পূর্বোক্ত প্রস্তাবের বিপরীত এক প্রস্তাব ওঠে। প্যারীবাবু সেই বিপরীত প্রস্তাবও সমর্থন করেন। তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যর আর্থার উইলসন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন—এ কেমন ব্যাপার, বিপরীত প্রস্তাবও আপনি সমর্থন করলেন ?

তাতে প্যারীচাঁদ অকুণ্ঠিত ভাবে বললেন—"Am I not capable of amendment, Sir ?"

*

কোনও এক সময়ে বাঙলার লেফটন্যান্ট গভর্নর স্যর এসলির কাছে প্যারীচাঁদ মিত্র কোনও এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেন। স্যর এসলি সেই সুপারিশপত্র সেক্রেটারির কাছে পাঠিয়ে দেন। তবুও সেই ব্যক্তিকে বিফল হতে হয়। সেই ব্যক্তি আবার প্যারীচাঁদকে ধরেন। এবার প্যারীচাঁদ স্বয়ং এসলির সংগে সাক্ষাৎ করেন। স্যর এসলি প্যারীচাঁদের স্বয়ং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে প্যারীচাঁদ বলেন—আগে আপনি যে পত্র দিয়েছিলেন – তাতে 'শ্রীযুক্ত' ছিল না— এবারে আপনাকে একখানি 'শ্রীযুক্ত' পত্র দিতে হবে, এই কারণেই আমার আসা। এসলি রহস্য বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকেন। তখন প্যারীচাদ তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দিলেন—কোনও এক জমীদার তাঁর কোন প্রজা আবেদনপত্র আনলে তাতে স্বাক্ষর করে নায়েবের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। নায়েবের প্রতি নির্দেশ ছিল 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর ব্যতীত কোনও আবেদন গ্রাহ্য হবে না। তাই আবেদনে 'শ্রীহীন' থাকলে তা গ্রাহ্য হত না। আমিও সেইজন্যে যাতে আপনি 'শ্রীযুক্ত' স্বাক্ষর দেন, তার জন্য স্বয়ং এসেছি।

একথা শুনে এসলিও হাসতে হাসতে 'শ্রীযুক্ত' আদেশপত্র দেন। বলা বাহুল্য, সেবারে প্যারীচাঁদের মুখ রক্ষা হয় এবং সেই ব্যক্তিকে বিফল হতে হয়নি।

মিশনারী ডাক্তার আলেকজান্ডার ডাফ ইংরেজি শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবার জন্য সর্বদা অনুরোধ করতেন। প্যারীচাঁদ উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, তার ওপর সংকীর্ণতা মানতেন না। এক দিন ডাফ সাহেব সরাসরি তাঁর কাছে এসে তাঁকে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করবার জন্য প্ররোচিত করতে লাগলেন। ডাক্তার মহান্ খ্রীস্টধর্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে তাঁকে অনেক উপদেশ দিলেন। প্যারীচাঁদ নীরবে উপদেশ শুনলেন—আর ধীরভাবে বললেন – দেখুন, ডাক্তার ডাফ, আমাদের এই পাখা-টানা বেয়ারাটি অতি চরিত্রবান লোক, কখনও মিথ্যে কথা বলে নি, কখনও চুরি করেনি, তার চরিত্র খুব উঁচু, কিন্তু সে খ্রীস্টের নাম পর্যন্ত জানে না, কখনও শোনে নি, আপনি কি বলতে চান যে লোকটি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাবে না ?

প্যারীচাঁদের এরূপ উত্তর শুনে ডাফ সাহেব অপ্রতিভ হলেন, আর কখনও তিনি প্যারীচাঁদের কাছে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণের জন্যে অনুরোধ করেন নি।

*

যখন শোভাবাজার-রাজবংশীয় নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজা' উপাধি পান তখনও কিন্তু তাঁর বড় ভাই রাজা কমলকৃষ্ণ দেব বাহাদুর 'মহারাজা' উপাধি পান নি।

সেই সময় একদিন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনে এক সভা বসেছে। নরেন্দ্রকৃষ্ণ ও কমলকৃষ্ণ দুভাই এক সংগে এসেছেন। প্যারীচাঁদও এসেছেন। তাঁদের দুভাইকে একত্রে দেখে প্যারীচাঁদ হাসতে হাসতে বড় ভাই কমলকৃষ্ণকে বললেন—রাজাবাহাদুর এবার ছোট ভাই 'মহারাজা' বাহাদুরকে প্রণাম কর।

রাজাবাহাদুর হাসতে লাগলেন।

*

এন্টালির প্রসিদ্ধ ধনী দেবনারায়ণ দের ছেলের জাঁকালো পাকা দেখা। প্যারীচাঁদ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দেনা-পাওনার ফর্দ চলছে। প্যারীচাঁদ দফায় দফায় দেবনারায়ণবাবুকে টাকা দিতে অনুরোধ করছেন। তাই দেখে দেববাবু বললেন— প্যারীবাবু, আপনি তো বেশ লোক, প্রত্যেকবারই আমাকে টাকা দিতে বলছেন ?

তাতে প্যারীবাবু সহাস্যে বললেন—বাপু, তুমি দেবে না তো কে দেবে ? তোমার আগে 'দে' পরে 'দে' সুতরাং তুমিই দেবে।

সকলে হেসে উঠলেন।

॥ পাঁচ ॥

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের সঙ্গে কাঁঠালপাড়ায় দেখা করতে গেছেন ; সেই খবর পেয়ে চুঁচড়ো থেকে ভূদেববাবু তাঁর ছেলে মুকুন্দদেবকে বঙ্কিমের বাড়ি পাঠালেন তাঁদের দুজনকে নিয়ে আসতে।

মুকুন্দদেব গঙ্গা পার হয়ে বঙ্কিমের বাড়ি গিয়ে দেখলেন—হেমচন্দ্র দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোতলে মদ খাচ্ছেন, বসবার আর ধৈর্য হয় নি।

মুকুন্দদেবকে দেখেই বঙ্কিম বললেন—দেখ, দেখ তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির কান্ডকারখানা একবার দেখ।

সেই কথা শুনেই হেম বাড়ুজ্যে উত্তর দিলেন—আর দেখ দেখ তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের আদর-আপ্যায়নের ধরণ-ধারণ, অভ্যাগতকে আসন গ্রহণের আহ্বান নেই।

মুকুন্দদেব উভয়ের কীর্তি দেখে থ।

*

হাইকোর্টে মামলা।

মফঃস্বল থেকে মোকদ্দমা এসেছে। এক পক্ষের উকীল দ্বারকানাথ মিত্তির আর অপর পক্ষের উকীল কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোকদ্দমাটি জমি সংক্রান্ত। অনেক দিনের ব্যাপার। আগে মুন্সেফ কোর্টে দু পক্ষই এসেছিল জমির দাবী নিয়ে। এ বলে আমার জমি, ও বলে আমার জমি। এক পক্ষ বলে, এ জমি বহুদিন ধরে আমার দখলে আছে, জমির ওপরে যে চন্ডীমন্ডপ—তাও আমাদের সম্পত্তি।

অপর পক্ষ বলে—ওসব মিথ্যে, ও জমি বহু কাল থেকে আমাদের দখলে। আর ও জমিতে কোনও চন্ডীমন্ডপ নেই।

জমিতে চন্ডীমন্ডপ আছে কিনা দেখবার জন্য মুন্সেফ গেলেন জমি দেখতে। গিয়ে সেখানে তিনি দেখলেন, জমিতে চন্ডীমন্ডপের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই দেখে মুন্সেফ দ্বিতীয় পক্ষের স্বপক্ষে রায় দিলেন।

এখন ব্যাপারটি হয়েছে এই—ওখানে চন্ডীমন্ডপ ছিল কিন্তু মুন্সেফের পরিদর্শন করার আগেই দ্বিতীয় পক্ষ চন্ডীমন্ডপকে ভেঙে একেবারে সাফ করে দিয়েছে। তার কোন চিহ্নই রাখে নি।

প্রথম পক্ষ ছাড়বার পাত্র নয়—তিনি হাইকোর্টে মোকদ্দমা তুলে আনলেন।

মোকদ্দমার নথিপত্র দেখে দ্বারকা মিত্তির বললেন হেম, মফঃস্বলের মুন্সেফের বুদ্ধিটা একবার দেখ—চণ্ডীমণ্ডপ ছিল কিনা, তাও একবার খোঁজ করে দেখেনি পর্যন্ত।

হেমচন্দ্র বললেন—মুন্সেফের বুদ্ধি ওরকম প্রায় গো-বুদ্ধিই হয়ে থাকে—কোন শা···মুন্সেফ হে, নামটি একবার দেখ তো।

নথিপত্র ঘেঁটে মুন্সেফের নাম বেরোল—মুন্সেফ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

হেমচন্দ্রের তখন মনে পড়ল—তিনি ওকালতী করবার আগে কিছুদিন মুন্সেফী করেছিলেন—তাই হাসতে হাসতে বললেন—ও দ্বারিক—ও দ্বারিক—ও যে আমিই হে।

*

উকীল উমাকালী মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। একবার তাঁরা উভয়ে চুনারে বেড়াতে যান। হেমচন্দ্র সেখানে একদিন দুপুরে বসে ত্রিপদী কবিতা রচনা করছেন।

এমন সময় উমাকালী তাই দেখে বললেন—ও রকম ত্রিপদী তো সকলেই রচনা করতে পারে।

হেমচন্দ্র—বেশ তো তুমিও বসে লেখ না।

উমাকালী—আপনি কি মনে করেন যে, আমি পারব না—নিশ্চয়ই পারব।

এই বলে উমাকালী তখনি কাগজ পেন্সিল নিয়ে ত্রিপদী লিখতে সুরু করলেন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল।

হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, কতদূর হল ?

উমাকালী মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন—গোড়ায় দুটো পদ লিখেছি, বাকীটা মেলাতে পারছি না—

হেমচন্দ্র—আচ্ছা কি লিখছ পড় ?

উমাকালী পড়তে লাগলেন—

"চুনার নগর পর্বত উপর"

ব্যাস।

হেমচন্দ্র—বাঃ বেশ হয়েছে এর পর আর কি লিখবে ভেবে পারছ না—লেখ—

"চুনার নগর পর্বত উপর
ললনা-বর্জিত দেশ।

ললনা বিরহে যার প্রাণ দহে
তাহার দফাটি শেষ ॥"

*

কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখনকার কালের নামজাদা লোকের নাম করে কয়েকটি ব্যঙ্গ রসের কবিতা লিখেছিলেন।

যখন সপ্তম এডোয়ার্ড প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিলেন, তখন তিনি একবার কলকাতায় আসেন। তাঁকে এদেশের ভদ্রমহিলা দেখাবার প্রস্তাব হওয়াতে হাইকোর্টের উকীল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রিন্সকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মহিলাদের দিয়ে বরণ ও অভ্যর্থনা করেছিলেন। এর পুরস্কারস্বরূপ তিনি সি এস আই খেতাব পেয়েছিলেন। কবি এই উপলক্ষে ব্যংগ কবিতা লেখেন—

"সাবাস ভবানীপুর, সাবাস তোমায়।
দেখালে অদ্ভুত কীর্তি বকুলতলায় ॥
পুণ্যদিনে বিশে পৌষ বাঙলার মাঝে।
পর্দা খুলে কুলবালা সম্ভাষে ইংরাজে ॥
কোথায় কৈশবী দল? বিদ্যাসাগর কোথা?
মুখুজ্জের কারচুপিতে মুখ হৈল ভোঁতা।
হরেন্দ্র-নরেন্দ্র গোষ্ঠী ঠাকুর পিরালি।
ঠকায়ে বাঁকুড়াবাসী কৈল ঠাকুরানি।

*   *   *

ও যতীন্দ্র, কৃষ্ণদাস, এববার দেখ চেয়ে।
বকুলতলায় পথের ধারে শত শত মেয়ে ॥

*   *   *

ধন্য মুখুজ্যে ভায়া, বলিহারি যাই।
বড় সাপটা দরে সাং করিলে খেতাব সি এস আই।"

*

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে হাইকোর্টের সর্বপ্রথম এদেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত মারা গেলেন। পরে দ্বারকানাথ মিত্রের নাম বিচারপতি পদে নিয়োগের খবর প্রকাশ পায়। দ্বারকা মিত্রের গায়ের রঙ খুবই কালো ছিল, হেমচন্দ্র সেই খবর শুনে বলেছিলেন—দোয়ারি যে অন্ধকার কালো, ওকে জজ মানাবে না। দ্বারিক মিত্তির তাই শুনে বললেন—এই তো ঠিক, শম্ভু পণ্ডিত সাহেবের মতো ফর্সা, তিনি সাহেব কি এদেশীয় হঠাৎ ঠিক করা যেতো না। এখন কোর্টে ঢুকেই লোকে

দেখবে কালো নেটিভ জজ আদালত অন্ধকার করে বসে রয়েছে, খুঁজে নিতে কষ্ট পেতে হবে না।

*

গায়ের রঙ কালো হওয়ার কথায় মনে পড়ল—অধ্যাপক রচফোর্ট (Rochfort) সাহেব একদিন কৃষ্ণনগর কলেজের আচার্য উমেশ দত্তকে বলেছিলেন—বিলেতে আমি রেভাঃ কে এম ব্যানার্জির কথা শুনেছি। এখানে এসে আমার বড় ইচ্ছে হল, কলকাতায় তাঁর চার্চে গিয়ে একবার তাঁর বক্তৃতা শুনে আসি। রবিবারে তাঁর চার্চে গিয়ে বসলুম, চোখ বুজে রইলুম পাছে বক্তার কালো রঙটায় আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত করে। যা শুনলুম তা ইংরেজের সর্বোচ্চশ্রেণীর sermon অপেক্ষা কম উপাদেয় বলে বোধ হল না।

॥ ছয় ॥

মূল মহাভারতের অনুবাদক ও 'হুতোম-পেঁচার নক্সার' রচয়িতা কালীপ্রসন্ন সিংহের কৌতুকপ্রিয়তা অতি অল্প বয়স থেকেই দেখা যায়। তাই দীনবন্ধু মিত্র বলেছিলেন—

"রহস্য-কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা
হুতোম পেঁচার ধাড়ী পড়েছেন ধরা।"

কালীপ্রসন্ন স্কুলে পাঠকালীন তাঁর সহাধ্যায়ীদের মাথায় চাপড় বা চাঁটি মারতেন। তারা একদিন শিক্ষকের কাছে নালিশ করল। শিক্ষক মশাই কালীপ্রসন্নের কাছে কৈফিয়ৎ চাইলেন। কালীপ্রসন্ন কিছুমাত্র ভীত না হয়ে বরং গর্ব করে বললেন—আমি জাতে সিংহ। জাত্যাভিমান কিছুতেই ত্যাগ করতে পারি না, তাই এ রকম করে থাকি।

শিক্ষক মশাই তো তার উত্তরে থ।

*

কালীপ্রসন্ন তখন হিন্দু কলেজের জুনিয়ার শ্রেণীতে পড়তেন। তখন তিনি 'আন্দোলন-পত্র' নামে একখানা দৈনিক কাগজ বের করতেন। এই পত্রখানি শ্লেটের ওপর 'হস্ত দ্বারা মুদ্রিত' হয়ে ক্লাসে ক্লাসে ছাত্রদের মধ্যে চালাচালি হয়ে প্রচার হত। কালীপ্রসন্ন ঐ পত্রের সম্পাদক ছিলেন। নানারকম হাস্যকৌতুক

প্রতিদিন তাতে থাকত। শিক্ষকরাও তাঁর বিদ্রূপবাণ হতে নিস্কৃতি পেতেন না। শিক্ষকদের নিয়ে তাঁর লেখা এরকম একটা কবিতা দেখা যায়—

Sturgeon সাহেবের class-এ পড়ত লাহা।
তার নীচে ঈশ্বর সাহা॥
ঈশ্বর সাহার ছোট পেট।
তার নীচে জয়গোপাল সেট॥
জয়গোপাল সেটেব লম্বা ঠ্যাংগ।
তাব নীচে বেণী ব্যাংগ॥
তার নীচে বনো কালো।
বনো কালো মারে বড়।
তার নীচে গুপী দড়॥
গুপী মিত্র, খাতায় চিত্র,
blankও বুকে blackও মার্ক॥ ইত্যাদি

হিন্দু কলেজে তাঁর সময়ে এঁরা শিক্ষক ছিলেন—টি এইচ স্টার্জন, ঈশ্বরচন্দ্র সাহা, জয়গোপাল শেট, বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী মিত্র, গোপীকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি।

কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল তখন বচফোর্ট (Rochfort), হেডমাস্টার হ্যাবিসন, গণিতের অধ্যাপক—ব্রাডবেবি (Bradbury), সেকস্‌পীযাব পড়াতেন—বীনল্যান্ড—রামতনু লাহিড়ীও তখন শিক্ষক। কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্ররা অধিকাংশ শিক্ষকদেব নাম নিয়ে তখন একটা অনুরূপ কবিতা লিখেছিল—

"সেক্‌সপীয়র পডাত বীনল্যান্ড।
বীটসনেব নাই জ্ঞান কাণ্ড।
বীনল্যান্ডেব লম্বা দাডি।
তার নীচে রামতনু লাহিড়ী॥
বামতনু লাহিড়ী সদাশয়।
তার নীচে দয়াল রায়॥
দয়াল রায়ের নাড়ী পট্‌কা।
তার নীচে গুরো হট্‌কা॥
গুরো হট্‌কার সদাই রোষ।
তার নীচে বেণী বোস।

বেণী ঘোসের সদাচার।
তার নীচে গোবিন্দ কোঙার।
গোবিন্দ কোঙারের মোটা বুদ্ধি।
তার নীচে গদাই চক্রবর্তী॥
গদাই চক্রবর্তীর পেটটা মোটা।
তার নীচে হরনাথ জ্যাঠা॥

দয়াল রায় খুব মদ খেতেন। গুরুচরণ চট্টোপাধ্যায় বেজায় লম্বা (হট্কা), হরনাথ জ্যাঠা হরনাথ মিত্র।

*

কালীপ্রসন্নের প্রতিবেশী পাল মশাই গরীবের ছেলে। লেখা-পড়া শিখে সভা-সমিতিতে গিয়ে বেশ গণ্যমান্য হন। কিন্তু তাঁর বাপের অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয় নি। তিনি খালি গায়ে সংসারের কাজ, হাটবাজার করেন। কালীপ্রসন্নের এই সব দেখে বড় বিসদৃশ লাগত। একদিন পাল মশাই সোনার চেন, চাপকান পরে যাচ্ছেন এমন সময়ে তাঁর বাবা খালি গায়ে বাজার নিয়ে ফিরছেন। তাই দেখে কালীপ্রসন্ন গম্ভীর ভাবে বললেন—পাল মশাই, পাল মশাই, আপনি কোথা থেকে এমন চাকর পান? আমার চাকর ব্যাটারা তো দিনরাত পড়ে পড়ে ঘুমোয়, আপনার চাকরটি তো বেশ দেখছি, রোদ্দুরে বারবার দোকান-বাজারে যায়।

বলাবাহুল্য পাল মশাই লজ্জিত হলেন আর জানালেন তিনি চাকর নন, তাঁর পিতা।

*

কালীপ্রসন্ন বেশ-ভুষায় সাদাসিধে ছিলেন। জাঁকজমক পোষাক তিনি বড় একটা পরতেন না। সে সময় ধনীদের মধ্যে ঢাকাই উড়ানি পড়বার একটা ফ্যাসান ওঠে। উড়ানির দাম এত বেশি যে খুব ধনী ব্যক্তি ছাড়া বড় একটা কেউ কিনতে পারত না। কালীপ্রসন্নের বাড়িতে পুজো। নিমন্ত্রণ রাখতে শহরের এক ধনী ব্যক্তি ঢাকাই উড়ানি গায়ে দিয়ে এসেছেন। তিনি দেখলেন কালীপ্রসন্ন সামান্য একটা দিশী চাদর গায়ে দিয়ে অতিথিদের আমন্ত্রণ করছেন। ভদ্রলোক চাদরটি বারবার নাড়চেন এবং চাদর সম্বন্ধে কিছু বলবেন বুঝতে পেরে কালীপ্রসন্ন তখন সরকার মশাই ও কয়েকজন চাকরকে ডাক দিলেন। ভদ্রলোক দেখে বিস্মিত হলেন যে কালীপ্রসন্ন অনেকগুলি সেই উড়ানি কিনেছেন এবং সরকার ও ভৃত্যদের মধ্যে তা বিতরণ করেছেন।

॥ সাত ॥

সেকালের পণ্ডিতরা শুধু তর্কের কচকচি নিয়েই থাকতেন না, সুযোগ-সুবিধে পেলেই 'রহস্য-নিবেদনম্' করতে পেছপাও হতেন না। প্রমাণ কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ প্রভৃতি। তা ছাড়া সেকালের বহু কবির উদ্ভট কবিতা পাওয়া যায় যা রসনির্ঝর। যেমন—

কোন এক রাজা এক কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, শ্রীহরি কেন শ্রীক্ষেত্রে কাষ্ঠময় হয়ে বাস করেন?

কবি উত্তর দিলেন—কেন হবেন না, কি সুখে তিনি ছিলেন?

"এক ভার্যা প্রকৃতি-মুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষং শয্যা বসতি জলধৌ বাহন পন্নাগারিং
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারি॥"

জগন্নাথ শ্রীহরির এক পত্নী সরস্বতী স্বভাবত মুখরা, দ্বিতীয়া লক্ষ্মী সদাই চঞ্চলা, পুত্র মদন বিশ্বজয়ী ও দুরন্ত, নিজের জলধিগর্ভে সর্পশয্যায় শয়ন। এই সব নিজের ঘরের কথা ভেবে ভেবে শ্রীহরি কাষ্ঠময় হয়ে গেলেন।

আমি অতদূর এগুচ্ছি না, নবদ্বীপ থেকেই সুরু করছি।

*

নবদ্বীপ বেশ রসিকতার দেশ।

নবদ্বীপের কোনও এক নৈয়ায়িক পণ্ডিত আহার করতে বসেছেন। তাঁর ব্রাহ্মণী পরিবেশন করছেন। উভয়েই অতি বাল্যে বিবাহিত হওয়ায় উভয়ের মধ্যে রসিকতার কোনও বাধা ছিল না। গৃহিণীর নাম সম্ভবত পঞ্চাননা দেবী। পণ্ডিত সেদিন আহারে বসে জলের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি গৃহিণীকে আহ্বান করলেন—'পাঁচী, পঞ্চি, প্রপঞ্চি, পঞ্চাননি, বারি আনয়।'

সুগৃহিণীও সুরসিকা। উত্তর দিলেন—আর্য, আচার্য, ভট্টাচার্য, শিরোধার্য, গঙ্গোদকং বা কূপোদকম্। (গঙ্গার জল না কুয়োর জল)।

*

কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় স্থান পেলেন ভারতচন্দ্র। গোপাল ভাঁড় ঠাট্টা করে বললেন

—'কপি নয় তো—ইনি একেবারে মহাকপি জাম্ববান। আমার জাম্ববান খুড়ো।'

ভারতচন্দ্রের ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ন হাসির ঝলক ফুটে উঠল। বললেন—'ভারি খুশি হলুম ভাইপো—জাম্ববান খুড়োকে ঠিক চিনে নিয়েছ বলে। তা তোমার বাবা—দাদা হনুমান ভালো আছেন তো?'

রসিক গোপাল এবার খাবি খেয়ে চুপসে গেল—হাসির রোল উঠল রাজসভায়। বেশি হাসলেন কৃষ্ণচন্দ্র। রাজ দরবারকে প্রথম চিনলেন ভারতচন্দ্র।

*

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর নির্দেশে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যান রচনা করেন। রচনা শেষে রাজসভায় ভারতচন্দ্র উপাখ্যানটি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে দেখালেন. মহারাজা উহা সাদরে গ্রহণ করে এক স্থানে কাৎ করে রাখলেন। তাই দেখে ভারতচন্দ্র ত্বরিৎগতিতে বলে উঠলেন—কাৎ করবেন না, মহারাজ, কাৎ করে রাখবেন না, সব রস ঝরে যাবে।

মহারাজ তাড়াতাড়ি পুঁথিখানি শুইয়ে রেখে হাসতে লাগলেন।

*

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র উপযুক্ত উত্তর পেলে খুব সন্তুষ্ট হতেন। তিনি চৈতন্যদেবকে অবতার বলে স্বীকার করতেন না এবং তাই নিয়ে পণ্ডিতদের সঙ্গে খুব তর্ক-বিতর্ক হত। এই সময়ে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশের পরমবৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামীর সঙ্গে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আলাপ হয়। আলাপের মাঝেই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে আপনার মত কি? তিনি যে অবতার ছিলেন, তার এমন কি যুক্তি থাকতে পারে তা বলতে পারেন?

গোস্বামী মশাই জিজ্ঞাসা করেন—এ সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—আমি এ বিষয়ে অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালাপ করেছি, কোন মতেই তাঁকে অবতার বলে স্বীকার করতে পারি নি।

তখন গোস্বামী বলেন—মহারাজ, চৈতন্যদেবের অবতারত্ব সম্বন্ধে আমারও এতদিন সন্দেহ ছিল, কিন্তু আজ আমার সে সন্দেহের নিরসন হল। ভগবান যে যে সময় অবতার করে পাঠিয়েছেন, সেই সেই সময় এক-একজন রাজাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী করে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু চৈতন্য অবতারে এ পর্যন্ত আমি কোনও রাজাকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী দেখতে পাইনি, আজ মহারাজকে সেই প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে

দেখতে পেলুম। সুতরাং চৈতন্যদেব যে অবতার, সে সম্বন্ধে আমার সকল সন্দেহ আজ নিরসন হল।

গোস্বামী মহাশয়ের এই রসালবাক্যে মহারাজ খুব সন্তুষ্ট হয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন।

*

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দুই রানী।

পিতার বর্তমানে প্রথমার সঙ্গে বিয়ে হয়। পিতার মৃত্যুর পর রাজা হয়ে দ্বিতীয়াকে বিবাহ করেন। এই বিবাহ ঘটে রানাঘাটে নৌকাড়ী বলে এক গ্রামেতে। একদিন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নদী দিয়ে তাঁর শ্রীনগরস্থ প্রাসাদে নৌকো করে যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে দেখলেন নৌকাড়ীর ঘাটে এক অপরূপ সুন্দরী কন্যা। তাকে দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে পরিচয় জেনে তার পিতার কাছে কন্যাটিকে বিয়ে করবার প্রার্থনা জানান। সেই ব্রাহ্মণ এই কথা শুনে বললেন—আপনি আমার মেয়েকে বিয়ে করবেন এ তো সৌভাগ্যের কথা, তবে কুলভঙ্গ করে কন্যাদান করলে সমাজে আমাকে হীন হতে হবে। যা হোক ব্রাহ্মণের আপত্তি টিকল না। রাজা সেই কন্যাকে বিয়ে করে রাজপ্রাসাদে নিয়ে এলেন। পরদিন বাসরঘরে নবপরিণীতাকে রূপোর খাটে শয়ন করিয়ে বললেন—দেখ আমাকে বিয়ে করে তুমি রূপোর খাটে শুতে পারলে···।

তেজস্বিনী সেই নবপরিণীতা রানী উত্তর দিলেন—আর একটু উত্তরে (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদে) গেলে, আমি সোনার খাটে শুতে পারতুম। অর্থাৎ আমার বাবা পরম কুলীন হয়ে যখন কুলভঙ্গ করে মহারাজকে কন্যা দিলেন—তখন আর একটু হীনতা স্বীকার করলে মুখসুদাবাদে নবাবের সঙ্গে বিয়ে দিলে সোনার খাটে শুতে পারতুম।

*

বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের ছেলে নীলমণি বড় রসিক পুরুষ ছিলেন। নীলু সকলকে হাসাইয়া মারেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা হল, নীলুকে একটু জব্দ করেন। কিন্তু নীলুকে জব্দ করা সহজ নয়। কোনও রকমে তাকে হারানো গেল না। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র পরামর্শ এঁটে নীলুকে ডাকতে পাঠালেন। ভোরবেলা নীলুর বাড়ি লোক গিয়ে হাজির। তাকে ডাকাডাকি করতে লাগল।

নীলমণি সশরীরে উপস্থিত হয়ে বললেন—ব্যাপার কি ?

লোকটি বললে—মহারাজ আপনাকে এখুনি তলব করেছেন। শিগগীর আসুন।

নীলু উত্তর করলে—আচ্ছা দরবারে দর্শন দেবো।

কিছুক্ষণ পরে নীলু দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখেন—মহারাজ থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেকেই মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছেন। রাজ-সভা রোদন মুখরিত। নীলু যে দিকে দেখে সেই দিকেই কান্নার ফোঁসফোসানি।

তখন নীলুও খুব জোরে কান্না সুরু করে দিলে। সে কান্না আর থামে না।

মহারাজ তখন নীলুকে বললেন—নীলু এত কাঁদ কেন? হয়েছে কি?

নীলু তখন কাঁদতে কাঁদতে, চোখ মুছতে মুছতে বলল—আজ আমার বাবার মরবার সময়ের কথাগুলি বারবার মনে পড়ছে বলে না কেঁদে আর থাকতে পারছি না।

মহারাজা বললেন—তোমার বাবা মরবার সময় কি বলে গেছলেন?

নীলু বললে—বাবা বলেছিলেন, নীলু তোর জন্য বড় দুঃখ হয়, বড় কষ্ট হয়, তুই যে একটুকুও লেখাপড়া শিখলি নি। তোর যে কি হবে তা বুঝতে পারছি না, হায় হায় তোর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে। তা আজ এখানে তাই স্বচক্ষে দেখে আমার এত কান্না পেয়েছিল যে তাই না কেঁদে থাকতে পারি নি।

নীলুকে জব্দ করতে গিয়ে মহারাজ নিজেই জব্দ হলেন।

*

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ দেওয়ানগিরি করে প্রভুত অর্থ উপার্জন করেন। তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে তিনি বিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। সেরকম বিরাট শ্রাদ্ধ বাঙলাদেশে কখনও হয় নি। সেই বিরাট সমারোহ দেখে নদীয়ার মহারাজা শিবচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে বলেছিলেন—দেওয়ানজী, এ তো শ্রাদ্ধ নয় এ যে দেখছি দক্ষযজ্ঞ ব্যাপার।

গঙ্গাগোবিন্দ হেসে বললেন—দক্ষযজ্ঞ কি বলছেন—এ তার চেয়েও বেশি, দক্ষযজ্ঞে শিবের আগমন হয় নি, এখানে শিবচন্দ্রের আগমন হয়েছে।

*

রঘুনাথ শিরোমণি ন্যায়শাস্ত্রের অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। ১৫শ শতকের শেষ ভাগে তিনি নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জন্মাবধি এক চক্ষুহীন ছিলেন। এজন্য অনেকে তাঁকে 'কানা শিরোমণি' বা কানাভট্ট শিরোমণি বলত। তখন নবদ্বীপের উপাধি দেবার ক্ষমতা ছিল না। মিথিলাই একমাত্র এর অধিকারী। মিথিলার গর্ব খর্ব করবার জন্য, আর নবদ্বীপে চতুষ্পাঠী থেকে উপাধি দেবার ক্ষমতা স্থাপন করবার জন্যে তিনি যখন মিথিলায় যান তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর।

সে সময়ে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্র মিথিলার প্রধান অধ্যাপক। তাঁর চতুষ্পাঠীতে তিনি ভর্তি হলেন।

চতুষ্পাঠীর ছাত্রগণ তার এক চক্ষু দেখে ব্যঙ্গস্বরে বলল—

"আখণ্ডলঃ সহস্রাক্ষো বিরূপাক্ষস্ত্রিলোচনঃ।
অন্যে দ্বিলোচনাঃ সর্বে কো ভবানেকলোচনঃ॥"

ইন্দ্র সহস্রলোচন, মহাদেব ত্রিলোচন, অন্য সকলেই দ্বিলোচন, আপনি একলোচন কে?

রঘুনাথ এই ব্যঙ্গোক্তি শুনে সদর্পে বললেন—

"কুশদ্বীপ মহাদ্বীপ নবদ্বীপনিবাসিনঃ।
তর্ক সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত শিরোমণি মনীষিণঃ।"

অর্থাৎ কুশদ্বীপের ন্যায় প্রধান দ্বীপ নবদ্বীপ আমার জন্মভূমি, আমি তর্কশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে শিরোমণি পণ্ডিত।

তারপর তর্কযুদ্ধে সমস্ত ছাত্রদের তিনি পরাজিত করেন।

নতুন ছাত্রের সঙ্গে কৌতুক করতে গিয়ে তাদের পরাভব স্বীকার করতে হল।

পক্ষধর রঘুনাথের তর্কে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর কাব্য ও ব্যাকরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় রঘুনাথ উত্তর দিলেন—

তর্কেষু কর্কশধিয়ো বয়মেব নান্যে
কাব্যেষু কোমলধিয়ো বয়মেব নান্যে।
তন্ত্রেষু যন্ত্রিতধিয়ো বয়মেব নান্যে
কৃষ্ণেষু সংযতধিয়ো বয়মেব নান্যে॥'

তর্কশাস্ত্রে আমার ন্যায় কর্কশবুদ্ধি কেউ নেই, কাব্যেও আমার ন্যায় সুকোমল মতি কেউ নেই, তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনায় আমার ন্যায় যন্ত্রিতধী কেউ নেই, আর কৃষ্ণবিষয়ক আলোচনায় আমার ন্যায় সংযত চিত্ত কেউ নেই।

*

প্রায় তিনশ বছর আগে মুনিরাম বিদ্যাবাগীশ নামে এক বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। ইনি বর্ধমানের শাকনাড়া গ্রামে থাকতেন। চতুষ্পাঠীও ছিল। বহু দেশের ছাত্র তাঁর কাছে পড়তে আসত। তখন নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা গঙ্গার দক্ষিণ পাড়ের রাঢ়দেশের লোকদের "রেঢ়ো মুখ" বলে তাচ্ছিল্য করতেন। মুনিরাম রেঢ়ো হয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতের প্রতিদ্বন্দ্বী হবেন এ কোন মতে তাঁদের সহ্য হত না।

একদিন কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে নবদ্বীপের রাজবাড়িতে বহু ব্রাহ্মণ

পণ্ডিতের নিমন্ত্রণ হয়। মুনিরাম প্রভৃতি রাঢ়দেশের কয়েকজন পণ্ডিত সেখানে উপস্থিত। তাঁদের দেখেই নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা রাজার কাছে অভিযোগ করেন—রেঢ়ো পণ্ডিতেরা ময়রার তৈরি মেঠাই খান ও শ্রাদ্ধে খেজুর গুড় ব্যবহার করেন, কাজেই তাঁরা ভ্রষ্টাচারী, প্রকৃত পণ্ডিতের সঙ্গে বিদায় গ্রহণের অযোগ্য।

মহারাজ তাঁদের অভিযোগ শুনলেন ও এই বিষয় অবগত হওয়ার জন্য মুনিরামকে জিজ্ঞাসা করলেন।

মুনিরাম বললেন—মহারাজ, আমাদের দেশে আমার ন্যায় পণ্ডিতদের আদৌ মেঠাই খাওয়া হয় না, কারণ সেখানে কোনও ব্রাহ্মণ মেঠাইএর দোকান করে না। যদিও কোন একটি ব্রাহ্মণের মেঠায়ের দোকান থাকে ও তার পাশে কোন ময়রার দোকান থাকে তবে কোন্ দোকানের মেঠাই খাওয়া উচিত আমাকে জিজ্ঞাসা করলে আমি বলব ময়রার দোকানের মেঠাই খাওয়া উচিত। মেঠায়ের দোকান করা ব্রাহ্মণের কাজ নয়, যে ব্রাহ্মণ ঐ কাজ করে, সে ব্রাহ্মণ নয়, পতিত। এরূপ পতিত ব্রাহ্মণ অপেক্ষা স্বধর্মে নিরত শুদ্ধাচারী শূদ্রও শ্রেয়। আর খেজুরে গুড় অশাস্ত্রীয় ইহা রাঢ়ের পণ্ডিতরা জানেন না বলে অভিযোগ হয়েছে। কিন্তু মহারাজ, খেজুরে গুড় শ্রাদ্ধাদিতে ব্যবহার করা দূরে থাকুক, খেজুর গাছ থেকে যে গুড় তৈরি হয় তা রাঢ়ের পণ্ডিতরা জানেন না। নবদ্বীপের পণ্ডিতেরা হয়তো জানতে পারেন। সুতরাং ইহা অশাস্ত্রীয় কিনা আমাদের জানা নেই।

তাঁর এই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখে ও সদুত্তর পেয়ে মহারাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন ও মুনিরামকেই সেই সভায় সর্বোচ্চ বিদায় দান করলেন।

*

অদ্ভুতশক্তিধারী নৈয়ায়িক পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নাম অনেকেই শুনেছেন। তাঁর বিদ্যাবত্তার পরিচয়ও তদ্রূপ। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করে, তখন এই দেশের শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করে দেশের মোটামুটি আইন সংকলনের ভার পড়ল জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ওপর। তাঁর বাড়ি ছিল ত্রিবেণীতে। তিনি কলকাতায় এসে মাইনে নিয়ে কাজ করার লোক নন। বাড়িতে বসেই স্বাধীন ভাবে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব-সেতু' ৪ খণ্ড তৈরি হল। গভর্নমেন্ট তাঁকে কার্যকালীন সাতশ টাকা বেতন ও আজীবন তিন শ টাকা করে বৃত্তি দিতে লাগলেন। *

স্যর উইলিয়ম জোনস তৎকালীন সংস্কৃত পণ্ডিত, বিদ্যোৎসাহী এবং সুপ্রীম কোর্টের জজ ছিলেন। একদিন তিনি তর্কপঞ্চাননকে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিত,

আপনাদের তো সকল নামের অর্থ আছে কিন্তু 'কানাই' নামের তো কোনও অর্থ খুঁজে পাই না। কৃষ্ণকে 'কানাই' বলে কেন?

তর্কপঞ্চানন রহস্য করে বললেন - আছে বৈকি? কানাই কিনা 'কাঁহা নাই' অর্থাৎ ভগবান সর্বত্র আছে।

*

তর্কপঞ্চাননের বাড়িতে এক পুরোহিত পণ্ডিত রোজ পুজো করতেন। সেদিন মালী বাগান থেকে বেশি ফুল জোগাড় করতে পারেনি। তাই সে এক-একটা ফুলকে দু'তিন খণ্ড করে পণ্ডিতের কাছে দিল। পণ্ডিত সেই ছেঁড়া ফুলের টুকরোগুলো লক্ষ্য করলেন। ঠিক সেই সময় তর্কপঞ্চানন সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁকে সামনে দেখে অপ্রতিভ করবার জন্য বললেন—ফুলের খণ্ডও কি ফুল নাকি, তর্কপঞ্চানন মশাই?

জগন্নাথ তখন কোনও উত্তর দিলেন না। ওখানে পণ্ডিতের দুবেলাই খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিছুক্ষণ পরেই তিনি চাকরকে ডেকে বললেন—পণ্ডিত মশায়ের রান্নার জন্যে এক খণ্ড মাছ এনে দাও।

সেদিন রবিবার। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা অনেকেই সেদিন মাছ খান না। সুতরাং পণ্ডিত মশাই বিস্মিত হয়ে বললেন—মাছ কি রকম, আজ যে রবিবার?

জগন্নাথ উত্তর দিলেন—কেন, ফুলের খণ্ড যদি ফুল না হয়, তবে মাছের খণ্ড তো মাছ নয়, আহারে দোষ কি?

পণ্ডিত মশাই একেবারে চুপ।

*

রেভা ডবলিউ ইয়েটস সাহেব 'জ্ঞানার্ণব' ও "সারসংগ্রহ" (বিলাতি রীতি-নীতি সম্বন্ধে পূর্ণ) গ্রন্থ দুটি তখনকার কলেজের জুনিয়ার ছাত্রদের সঙ্গে লিখেছিলেন। স্কুল বুক সোসাইটি তা প্রকাশ করেছিল।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার তখন জুনিয়ার কলেজের বাঙলার অধ্যাপক। তিনি ছাত্রদের কাছে গল্প করতে খুব ভালোবাসতেন। আর মুখে মুখে বাংলা ব্যাকরণ পড়াতেন। মদনমোহন যেমন রসিক ছিলেন তেমনি কড়া লোক ছিলেন।

একদিন ইয়েট সাহেবেরও তাঁর সঙ্গে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনা থেকে বচসা হয়। তখন সাহেব মদনমোহনকে উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোথায় বাংলা শিখেছেন? পণ্ডিত মহাশয় গম্ভীরভাবে বললেন—বিলেতে। তর্কালঙ্কারের বিদ্রূপে তর্ক থেমে গেল।

*

এক ধনী ব্যক্তির বাড়িতে মহাসমারোহে আদ্যশ্রাদ্ধ। সভাপতি চতুর্ভুজ ভট্টাচার্যের ও প্রধান নৈয়ায়িক জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের ওপর সমস্ত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিমন্ত্রণের ভার। এক গরীব ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ পাননি। নিমন্ত্রণ পাওয়ার জন্য তিনি উভয়কেই অনুরোধ করেন। চতুর্ভুজ বললেন—মশাই, আমার এ বিষয়ে কোনও হাত নেই। আপনি জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে যান, তাঁকে ধরুন। একথা শুনে ব্রাহ্মণ আর থাকতে না পেরে বললেন—

"চতুর্ভুজস্য ভুজো নাস্তি নির্ভুজং কিং করিষ্যতি"—

পণ্ডিত মশাই, চতুর্ভুজ হয়ে আপনার যদি হাত না থাকে, তবে জগন্নাথের হাত থাকা কি সম্ভব? বলাবাহুল্য ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত হলেন।

*

একশত বছরের ওপর বয়সে ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর স্মৃতিশক্তি ও তীক্ষ্নবুদ্ধি পূর্ণভাবেই ছিল। তাঁকে গঙ্গায় তীরস্থ করলে তাঁর প্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—গুরুদেব, নানা শাস্ত্র পড়িয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু 'ঈশ্বর কি বস্তু'—তা এক কথায় বুঝিয়ে দেন নি তো?

অন্তর্জলি অবস্থা তখন তর্কপঞ্চাননের। তা সত্বেও তিনি একটু হেসে মনে মনে এই শ্লোকটি রচনা করে ছাত্রকে বললেন—

"নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নারাকারাম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে।"

একদল (ঈশ্বরকে) নরাকার বলেন, কেহ কেহ বা নিরাকারও বলেন। কিন্তু আমরা দীর্ঘ সম্বন্ধের জন্য অর্থাৎ বহুদিন গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য নারাকারাকে (অথবা নীরাকারাকে) উপাসনা করি।

*

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও পরে অধ্যক্ষ হয়ে ছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবনে হোরেস উইলসন সাহেব সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন।

গ্রামের টোলের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্করত্নের কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে কলকাতায় এসে প্রেমচন্দ্র সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য-শ্রেণীতে ভর্তি হবার জন্য হোরেস উইলসন সাহেবের কাছে আসেন। উইলসন সাহেব তাঁকে এর আগে তিনি কোন্ অধ্যাপকের কাছে পড়াশুনা করেছিলেন তা জিজ্ঞাসা করেন। সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রেমচন্দ্র উভয়ের দিকে চেয়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের হাতে দিলেন—

তাতে লেখা ছিল—

"গোপালো দ্বৌ জয়ৌ দ্বৌ চ দ্বাবেব তর্কমণ্ডনো।
মথুরাধিপ একোহি বৃন্দাবনাধিপোঽপরঃ॥"

"দুইটি 'গোপাল' পুনঃ দুইটিই 'জয়'
দুইটিই জানি 'তর্কমণ্ডন' নিশ্চয়।
একটি 'গোপাল' মোর মথুরা ভুবনে।
অন্য যে 'গোপাল' মোর তিনি বৃন্দাবনে॥"
(পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর অনূদিত)

টোলের গুরুর নাম ও সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যাধ্যাপক উভয়েরই নাম 'জয়গোপাল' হলেও টোলের জয়গোপালকে কতক পরিমাণে কঠোর শব্দরাজ্যের (মথুরা) অধিপতি ও কলেজের জয়গোপালকে মধুর ভাবরাজ্যের (বৃন্দাবন) অধিপতি বলে তিনি নির্ণয় করেন।

শ্লোকটি হোরেস সাহেব শুনে খুব প্রীত হয়ে তাঁকে সাহিত্যশ্রেণীতে ভর্তি করেন।

*

প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ সেকালের পণ্ডিত হলেও তাঁর বেশভূষার দিকে খুব নজর ছিল। গ্রীষ্মকালে ধুতি উড়ানি, শীতকালে শাল, চটি জুতো, হাতে ছড়ি—সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

হারা নামে এক বুড়ো ধোপা তর্কবাগীশ মশাই-এর বাড়িতে বহুদিন কাপড় কাচত। কাপড় খুবই ভালো কাচত, কিন্তু আনতো বিলম্ব করে। একদিন অনেক দিন পরে হারা তর্কবাগীশের কাপড়ের মোট নিয়ে এল। গ্রীষ্মকালের দুপুর, ঘেমে অস্থির, সেই সময় তর্কবাগীশের নজর পড়তেই তিনি চিৎকার করে অন্দরের দিকে চেয়ে বললেন—ওরে কাপড়গুলো গুণেগেঁথে নে, আর হারাকে দূর করে দে, তাকে আর কাপড় কাচতে দেব না। হারা এ সব কথা শুনতে অভ্যস্ত। সে থামের পাশে বসে চাদরের হাওয়া খেতে খেতে নির্বিকার ভাবে বলল—আজকাল ধোপার ব্যবসা বেশ ভালো, যার বাড়িতে যাই, জামাই আদর পাই, সকলেই খড়্গহস্ত। পণ্ডিতের মুখে এ রকম রাগের কথা শোভা পায় না। দেখছি এ দুনিয়াতে 'সর্বস্কন্ধী'র হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না।

সে নিজের মনেই বকে যেতে লাগল। না, না, পণ্ডিতের দোষ কি ? পণ্ডিত যাকে একবার পাঠ দেন, সে পোড়ো অমনি গোলাম, পথে-ঘাটে যেখানে তাঁকে দেখে অমনি গুরু বলে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম, একেই বলে ওস্তাদি। কিন্তু ধোপা, দর্জি, যাত্রাদলের সাকরেদরা সে লোকই নয়, পণ্ডিতের এ জ্ঞানটুকু নেই। যাকে একবার কাচার ধরণ-ধারণ শেখালুম, ইস্ত্রি ধরতে শেখালুম—সে অমনি মিস্ত্রি হয়ে বসল। আলাদা ব্যবসা খুলল, দু-ঘর খদ্দেরও ভাগিয়ে নিয়ে গেল। দর্জির কাছে কাট-ছাঁট শিখল, অমনি দর্জি হয়ে নতুন দোকান ফাঁদলো, যাত্রাদলের ছেলে দু-একবার আসরে নামল—অমনি নতুন দল খুলল। সাকরেদরা ওস্তাদ বলে মানে না। নইলে আমার ভাবনা কি ? গঙ্গার এপারে ওপারে হারুর কাছে কাজ শেখেনি এমন ধোপাই নেই। কিন্তু কাজের সময় কাকেও পাওয়া যায় না, গুরুও বলে কেউ মানে না।

হারা ধোপার কথা শুনতে শুনতে তর্কবাগীশ এগিয়ে এলেন—বললেন—তোমার কথার মধ্যে 'সর্বস্কন্ধী' কথাটার মানে তো বুঝলুম না। হারা বললে—'সবস্কন্ধী' মানে জান না, তবে শোন। এক বামুন মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে এক গাছের তলায় একজনকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার জাত কি ?

সে বলল—আমি সর্বস্কন্ধী।

ক্লান্ত বামুনের মেজাজ চড়ে গেল, বলল—সর্বস্কন্ধী, তুই ব্যাটা সকলের কাঁধে চেপে বেড়াস।

সে বলল—আজ্ঞে হ্যা, সকলের কাঁধে চড়েই তো থাকি। এ শুনে ব্রাহ্মণ তো আরও রেগে বললে—কি ব্যাটা তুই বামুনেরও কাঁধে চড়িস।

সে বললে। আজ্ঞে হ্যা, আপনি বামুন হলেও, আপনার কাঁধে চড়ে বসে আছি আর সময় পেলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সকলের কাঁধে চড়ে থাকি।

তখন ব্রাহ্মণের চৈতন্য হল। তাকে 'চণ্ডাল' বলে বুঝতে পারলে। 'রাগ চণ্ডাল' মানুষের ঘাড়ে চড়লে জ্ঞান-অজ্ঞান থাকে না।

তখন তর্কবাগীশের হারার প্রথম কথাটি মনে পড়ল। তিনি বললেন—হারান, তুই যে এত জ্ঞানী তা জানতুম না, তোকে কেউ ওস্তাদ বলে নি, আমি তোকে ওস্তাদ বলব, তবে কাপড় কাচতে পারব না। এই বলে হারানের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন।

*

সেকালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি একজন খ্যাতনামা

স্মার্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন। বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন প্রভৃতি তাঁর ছাত্র। একদিন শিরোমণি মশাই কলেজে চলেছেন। শীতকাল, গায়ে একখানি লাল রঙের বনাত। তাঁর পেছনে কয়েকজন ছাত্রও কলেজে আসছিল।

তাঁদের মধ্যে একজন ছাত্র শিরোমণি মশাইকে বলল—ভট্টাচার্য মশাই, আপনার লাল বনাতের ওপর সূর্যের আলো পড়াতে আপনার তেজ যেন সূর্যের মতো দেখাচ্ছে।

তখন শিরোমণি মশাই কোনও কথা না বলে আরও দ্রুত পায়ে চলতে লাগলেন। ছাত্ররাও তাঁর পেছনে পেছনে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি তিনি কলেজে ঢুকে তাঁর চেয়ারে বসে এক দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে সেই ছাত্রটির দিকে চেয়ে বললেন—বাপ, বড্ড বেঁচে গেছি, আর একটু হলেই তুই আমাকে বগলে পুরেছিলি।

তখন ছাত্ররা তাঁর কথা অনুধাবন করে উচ্চহাস্য করে উঠল। আর যে ছাত্র তাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছিল—তাকে হনুমান বলে উপহাস করাতে সেও অপ্রস্তুত হল।

*

রামনারায়ণ তর্করত্ন মশায়ের নাটকাদি প্রকাশ হলে তিনি 'নাটুকে রামনারায়ণ' নামে খ্যাতি অর্জন করেন ও তাঁর নাটক অনেক ধনী ব্যক্তি বহু ব্যয়ে নিজেদের বাড়িতে অভিনয় করাতেন। সেই সূত্রে ধনী ব্যক্তিরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন ও তিনিও তাঁদের বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতেন।

একদিন কলকাতায় এক বিখ্যাত ধনীর বাড়ির হল ঘরে কয়েক জন যুবক সাহেবী কায়দায় খানা খাচ্ছে। বাবুর্চি পরিবেশন করছে। এমন সময় রামনারায়ণ মশাই সেদিক দিয়ে বাড়ির কর্তার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখেই তারা বললে—আসুন তর্করত্ন মশাই, আমাদের সঙ্গে একটু খানা খেয়ে যান।

তর্করত্ন মশাই খুব রসিক। উত্তর দিলেন—তোমরা বাপু শহুরে লোক, 'খানা' খাও, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, 'খানায়' মলত্যাগ করি।

*

একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাই এসেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁকে দেখেই চেঁচিয়ে বললেন—'ওরে কে আছিস, তর্করত্ন মশাইকে চৌকি দে'। তর্করত্ন কপালে হাত দিয়ে বললেন—হা, ভগবান, আমি গরীব ব্রাহ্মণ, চোরও নই, বাটপাড়ও নই—আমাকেও 'চৌকি' (পাহারা) দেবে।

এক সময় প্রসিদ্ধ ধনী আশুতোষ দেবের (ছাতুবাবুর) বাড়িতে ব্রাহ্মণ-বিদায় হচ্ছিল। ছাতুবাবু স্বয়ং উপস্থিত থেকে দক্ষিণা দিচ্ছিলেন। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ছাতুবাবু তিন টাকা দক্ষিণা দেন। তারপর তরুণ বয়স্ক রামনারায়ণ তর্করত্ন মশাইকে দু টাকা দিলেন। তর্করত্ন দু টাকা পেয়ে ছাতুবাবুকে বললেন—মশাই, আপনি পূর্ব ব্রাহ্মণের প্রতি নেত্রপাত (তিনে নেত্র অর্থাৎ তিন) আর আমার প্রতি পক্ষপাত (দুয়ে পক্ষ অর্থাৎ দুই) করলেন। আমার প্রতিও নেত্রপাত করুন।

ছাতুবাবু তর্করত্নের বাকচাতুর্যে প্রীত হয়ে আমোদ করবার জন্যে বললেন—তর্করত্ন মশাই, ত্রিনেত্র কেবল মহাদেবেরই সম্ভব, মানুষের তো ত্রিনেত্র নেই ?

তর্করত্ন—আপনাকে তো আমরা আশুতোষ বলেই জানি, ত্রিনেত্র কই ? পঞ্চানন আশুতোষের পঞ্চদশ নেত্র আছে শুনেছি।

তর্করত্নের কথায় প্রীত হয়ে ছাতুবাবু তাঁকে পঞ্চদশ মুদ্রাই দক্ষিণা দেন।

*

বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগেও তর্করত্ন রসিকতা করতেন। ছাত্র যাদব-কিশোর গোস্বামী পড়া না পারলে তাকে ডাকতেন—যাদব কি শোর (শূকর), আর পড়ায় অমনোযোগী হলে উমেশকে বলতেন—'উ-ভো-মেষ'।

*

তর্করত্ন মশাই বৈদিক ব্রাহ্মণদের ফলারের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন রকম ফলারের উল্লেখ করেছেন কবিতায়, কিছু নমুনা দিচ্ছি—

উত্তম ফলার—

"ঘিয়ে ভাজা তপ্ত লুচি দু চারি আদার কুচি,
কচুরি তাহাতে খান দুই।
ছক্কা আর শাকভাজা, মতিচুর বোঁদে গজা
ফলারের যোগাড় বড়ই ॥
নিখুঁতি, জিলিপি গজা, ছানাবড়া বড় মজা
শুনে সক্ সক্ করে নোলা।
হরেক রকম মণ্ডা, যদি দেয় গণ্ডা গণ্ডা
যত খাই তত হয় তোলা ॥
খুরী ভরি ক্ষীর তায়, চাহিলে অধিক পায়
কাতারি কাটিয়া শুকো দই।

অনন্তর বাম হাতে দক্ষিণা পানের সাথে
উত্তম ফলার তাকে কই ॥"

মধ্যম ফলার—

"সরু চিঁড়ে শুকো দই মর্তমান ফাঁকা খই
খাসামণ্ডা পাত পোরা হয়।
মধ্যম ফলার তবে বৈদিক ব্রাহ্মণ কবে
দক্ষিণাটা ইহাতেও রয় ॥"

অধম ফলার—

"গুমো চিড়ে জলো দই তিত গুড় ধেনো খই
পেট ভরা যদি নাহি হয়।
রোদ্দুরেতে মাথা ফাটে হাত দিয়ে পাত চাটে
অধম ফলার তাকে কয় ॥"

'ছাইভস্ম'এর কবি রসময় লাহা বিদ্রূপাত্মক কবিতায় সিদ্ধ হস্ত।

"গুরু কহে—'শালগ্রাম শিলা
ইনি চতুর্ভুজ নারায়ণ
অনাদি অনন্ত এঁর লীলা
ব্যাপ্ত চরাচর ত্রিভুবন'।
শিষ্য কহে 'গোল শিলাখণ্ড
কিসে হল চতুর্ভুজধারী,
প্রভু, আমি নিতান্ত পাষণ্ড
দীক্ষা দাও কেমনে নেহারি'।
গুরু কহে—'শালগ্রাম স্মরি
হস্তপদ যুক্ত করি তার
ভক্তিভাবে বস ধ্যান ধরি
বিষ্ণুরূপে হেরিবে ত্বরায়।'
গুরু উপদেশ ভেবে ভেবে
বসে ধ্যানে শিষ্য সে মর্কট
গুরু কহে 'কি হেরিছ এবে'
শিষ্য কহে 'হল যে কর্কট'।"

॥ আট ॥

পাঁচালীকার দাশরথি রায়ের রহস্যপ্রিয়তা লোকখ্যাত ছিল। ইনি ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। দাশরথির বাড়ি ছিল বর্ধমান জেলার পীলা গ্রামে।

একজন দাশরথিকে জিজ্ঞাসা করেন—'নিবাস' কোথায় ?

দাশরথি উত্তর দেন—শিমুলে। (অর্থাৎ যার গন্ধ নেই)

লোকটি হেসে বলেন—বাস কোথায় ?

উত্তরে দাশরথি বলেন—'পদ্মবেলে' (যেখানে গন্ধ আছে)

লোকটি আবার বলেন—'বাড়ি কোথায় ?'

তখন দাশরথি বলেন—'রোগের ওঁছায়।' অর্থাৎ রোগের ওঁছা কিনা 'পীলায়'।

*

দাশরথি শ্বশুরবাড়ি চলেছেন। পথে কয়েকজন লোক যুক্তি করল, দাশরথিকে আটকে রেখে কিছু রহস্য শোনা যাক। তারা ঠিক করল যে দাশরথিকে তামাক খাওয়াব বলে বসিয়ে রেখে বারবার তামাক সাজা হবে, হাতে রাখা হবে, কিন্তু তাকে দেওয়া হবে না। তা হলেই যা হোক কিছু তাঁর কাছ থেকে শোনা যাবে।

এই রকম স্থির করে তারা মাঠের মধ্যেই তাঁকে ডেকে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে তাদের যুক্তিমত কাজ করতে লাগল।

দাশরথি তো অবাক্। কিছুক্ষণ এ রকম দেখে শুনে তিনি একটা গাছের দিকে এক মনে চেয়ে কি যেন দেখতে লাগলেন।

তাঁর কাছে কোন কথা শুনতে না পেয়ে লোকগুলো অস্থির হয়ে বলল—রায় মশাই, গাছের ওপর কি দেখছেন ?

রায় মশাই অমনি বললেন—আর কিছু দেখিনি, কেবল দেখছি আপনারা সকলে এখানে আছেন, না গাছেও দু-চার জন আছেন।

*

রায় মশাই নবদ্বীপে গেছেন গান শোনাতে। নবদ্বীপের পণ্ডিতরা তাঁর গান শুনে বললেন—'তুমি সিদ্ধ'।

দাশরথি উত্তরে বললেন—আমার এ যাত্রা সিদ্ধতেই গেল, আতপ আর পেলুম না।

একদিন নবদ্বীপের শ্রীরাম শিরোমণি মশাই বলেছিলেন—দাশরথি, তুমি সংগীতে শিবতুল্য।

উত্তরে দাশরথি বললেন—তুল্য কেন? আমি শিবই।

তাতে শিরোমণি রেগে বললেন— তোমার যে দেখছি বড্ড অহংকার।

দাশরথি বললেন—শিব ত্রিলোচন, আমিও ত্রিলোচন, যদি তাই না হব তবে 'শিরোমণি' দেখব কেমন করে? মানুষের যে দুচোখ আছে, তাতে তার মাথার জিনিস দেখতে পায় না। আমি যখন শিরোমণি দেখতে পারছি, তার দ্বারা আমার আর একটা চোখ আছে বলে প্রমাণ হচ্ছে। কাজেই আমার তিন চক্ষু, সুতরাং আমিই শিব।

এই কথা শুনে শিরোমণি তাঁকে আলিংগন করলেন।

*

একসময় দাশরথি কৃষ্ণনগর গোয়াড়িতে গান গাইছিলেন। এমন সময় কয়েকজন যুবক এসে তাঁকে বলল—বিরহ গান গাইতে হবে।

তাতে তারা হট্টগোল করে গান বন্ধ করে দেওয়ায় তিনি চুপ করে বসে রইলেন।

কয়েকজন প্রবীণ এসে তাঁকে বললেন—রায় মশাই, বিমুখ কেন?

উত্তর দিলেন—মুখ নেই বলে।

আবার প্রশ্ন - কেন মুখ নেই?

তখন বললেন—গো-আড়িতে পড়েছি বলে—অর্থাৎ গরুর আড়িতে পড়েছি বলে।

*

দাশরথি হুড়কডাংগায় গান গাইতে গেছেন। গ্রামের লোক গানের মর্ম বুঝতে না পেরে হৈ-চৈ করে গান বন্ধ করে দেয়। অনেকে আবার নানা কটূক্তি করে। তাই শুনে দাশরথি তৎক্ষণাৎ সুর করে বললেন—

"যে ভগীরথ গংগা আনলেন ত্রিভুবন ধন্যে।
তার আবার খেদ রইল পুকর-প্রতিষ্ঠার জন্যে ॥
যার বিয়েতে কুলো ধরেন স্বয়ং লক্ষ্মী আসি।
তার বিয়েতে এয়ো হল না আকালে হাড়ীর মাসি ॥
নদে শান্তিপুরে যার জয় জয় রব।
হুড়কডাংগায় হার হল তার হরির ইচ্ছা সব।"

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিদ্রূপাত্মক ও রসাত্মক কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর জ্যাঠতুত ভাই মহেশচন্দ্র রসাত্মক রচনায় কিছু কমতি ছিলেন না। তাঁদের উভয়ের মধ্যে কবিতার লড়াই হতো। কোনও কারণে মহেশচন্দ্র প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর ঈশ্বরচন্দ্রের সংগে কবিতার যুদ্ধ করবেন না। তাতে ঈশ্বর গুপ্ত বিদ্রূপ করে বলেন—'দাদা, ল্যাজ গুটোলে কেন ?'

তাঁর প্রত্যুত্তরে মহেশচন্দ্র বললেন—

"ওরে দুই ভাইয়ের দুই থাকলে ল্যাজ
থাকতো না সংসার।
একে তোমার ল্যাজে মজে গেছে
সোনার লংকা ছারখার।"

*

পথ বহু দূর।

কাঁচড়াপাড়া আর রংপুর। রেলপথ নেই, স্টীমার নেই, নৌকা আর হাঁটা পথ। তখন 'প্রভাকর' পত্র সারা বাঙলায় দীপ্ত পেত আর 'রংপুর-বার্তাবহ'ও কম যেত না। কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পত্তি 'প্রভাকর'। তিনি তার সম্পাদক। রংপুরের অন্তর্গত কুণ্ডীর বিদ্যোৎসাহী জমীদার কবি কালীচন্দ্র রায় চৌধুরীর সম্পত্তি 'রংপুর-বার্তাবহ' কিন্তু তিনি সম্পাদক নন, প্রধান লেখক। দুজনেই দুজনের মনের কথা জানতেন কেবল মৌখিক পরিচয় ছাড়া। অন্তরে অন্তরে উভয়েই উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন।

কালীচন্দ্রের কাব্যানুরাগ ঈশ্বরচন্দ্রকে উদ্বেলিত করে তুলল। তিনি তাঁর সংগে পরিচিত হতে উৎসুক হলেন।

পথ বহুদূর। ঈশ্বর গুপ্ত বিচলিত হলেন না। জলপথে আর স্থলপথে যাত্রা সুরু করলেন। অবশেষে কোনও এক দিনান্তে জমীদার-প্রাসাদের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রাতটা কোনও রকমে কাটিয়ে দিলেন।

সকাল বেলা।

জমীদারের দরবার-গৃহে লোকে লোকারণ্য। কত অর্থী-প্রার্থীর আগমন ও নিষ্ক্রমণ। সেই জনস্রোতের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত নীরবে এক কোণে অবস্থান করতে লাগলেন। একে একে সবাই চলে গেল। আবেদন নিবেদন আর স্তুতির পালা যার যা শেষ হল। দরবার-গৃহ প্রায় শূন্য। তখন জমীদারের দৃষ্টি পড়ল গৃহকোণে এক ব্যক্তির ওপর।। তিনি নীরবে আছেন। আবেদন নেই, নিবেদন

নেই, স্তুতিও নেই। তাঁর সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখেই জমীদারের কবি-ভাবের উদয় হল। তিনি প্রশ্ন করলেন—

"কে তুমি? কোথায় বাস? কোথা থেকে এসেছ?
কিবা প্রয়োজনে মম সন্নিধানে ভাতিছ?"

ঈশ্বরচন্দ্র তৎক্ষণাৎ কবিতায় উত্তর দিলেন—

"নামে ধামে কিবা কাজ—নরপতি মহাশয়?
অতিথির পরিচয় জিজ্ঞাসা উচিত নয়।"

কালীচন্দ্র রহস্য করে বললেন—

"এখনও মধ্যাহ্নের রয়েছে অনেক বাকী
কি করি অতিথি হবে? মিছে কেন দাও ফাঁকি।"

তখন ঈশ্বর গুপ্ত নিজের পরিচয় রহস্যভাবেই দিলেন

'প্রভাকর দীপ্তি হেরি, তৃপ্তি পায় সরোবরে,
টলটল করে পদ্ম আপন গৌরব ভরে।
সৌরভ বাহিয়া তার আনি দেয় সমীরণ
সৌরভ পাইয়া অলি ধায় তথা অগণন।
না জিজ্ঞাসি তাহাদেরে পদ্ম করে মধু দান
জগতের এ নিয়ম কর না কি অবধান?"

কালীচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় পেয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরে আনন্দের ফোয়ারা ছোটালেন।

*

কবিওয়ালা 'লোকে কানা' তখনকার দিনে নামকরা পাঁচালীকার। তাঁর পুরো নাম—লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস। ঠনঠনে বাড়ি, কায়স্থ-বংশে জন্ম। একদিন এক বিশেষ ধনী ব্যক্তি তাঁর নিজের বাগানবাড়িতে তাঁকে বনভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। বিশ্বাস বাগানে গিয়ে উক্ত ব্যক্তির সঙ্গে এমন পেট ভরে খেলেন যে তাঁর পাতে কিছুই রইল না—যাকে বলে চেঁচে-পুছে খাওয়া আর বাবুর হল বাবুয়ানা খানা। পাতে প্রায় সব পড়ে রইল। চাকর এসে পাতা ফেলে দেয়। বিশ্বাসের পাতে কিছু নেই—তাই কোন জন্তু দূরে যাক পিপড়ে এসে নিশ্বেস ফেলে চলে যায়। কিন্তু এক কুকুর এসে বাবুর পাতে পরমানন্দে আহার করে গেল। তাই দেখে বাবুটি শ্লেষ করে বললেন—ছিঃ বিশ্বাস, দেখ তোমার পাতে কুকুরও আহার করে না।

লক্ষ্মীকান্ত তৎক্ষণাৎ, উত্তর দিলেন—মশাই এ কুকুর ভিন্ন গোত্রে খায় না।

*

শোভাবাজারের পাঁচালীকার গংগানারায়ণ নস্কর বিশ্বাসের প্রতিবেশী। নস্কর কর্তা ছিলেন বটে কিন্তু কবি ছিলেন না। একদিন সভায় বিশ্বাস বসে আছেন —নস্কর এসে তাঁর কাঁধে 'কাঁদে বাড়ি ধ' করে বসলেন। বিশ্বাস এর কিছু পরে আস্তে আস্তে উঠে পেছনে এসে মাথায় 'তে পুঁটুলে শ' করে বসে পড়লেন।

সভার লোক হো হো করে হেসে উঠল।

*

কবিয়াল ভোলা ময়রা মুখে মুখে কবিতা আওড়ান, গান করেন। একবার কাশিমবাজারের রাজা হরিনাথ রায় তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি তো নানা জায়গায় কবিগান গেয়ে বেড়াচ্ছ—কোন্ কোন্ জায়গায় কি কি ভাল জিনিস দেখেছ বলত ?

সহাস্যে ভোলা ময়রা উত্তর দিলেন—

"রংপুরের শশুর ভাল, রাজশাহীর জামাই।
মেদিনীপুরের শাশুড়ী ভাল সোহাগ সদাই।
শান্তিপুরের শালী ভাল, ভাল তার খোঁপা।
গুপ্তিপাড়ার গিন্নি ভাল, ভাল তার চোপা॥
সুখসাগরের নাতী ভাল, বড় রসবতী।
কাটোয়ার ভাজ ভাল, দেওরেতে প্রীতি॥
দিনাজপুরের কায়েত ভাল, হাওড়ার ভাল শুঁড়ি।
পাবনা জেলার বৈষ্ণব ভাল, ফরিদপুরের মুড়ি।
বর্ধমানের চাষী ভাল, চব্বিশপরগণার গোপ।
পদ্মানদীর ইলিস ভাল, কিন্তু বংশ লোপ।"
ইত্যাদি।

*

একদিন ভুদেব মুখোপাধ্যায়ের কোন বন্ধু ভুদেববাবুকে বললেন—কালিদাস মৈত্র বলেছেন—ভুদেব আমার 'মানব-দেহতত্ত্ব' কলম দিয়ে কেটেছে, আমি তার 'প্রকৃতি-বিজ্ঞান' কোদাল দিয়ে কাটব।

তাই শুনে ভুদেববাবু হেসে বললেন—যার যা অস্ত্র সে তাই দিয়ে কাটে।

*

এক সময় ভূদেববাবু কোন বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করতে যান। নীচু ক্লাশের একটি মেয়েকে ডেকে তার নাম জিজ্ঞাসা করেন। মেয়েটি উত্তর দেয়—ব্রজবালা দাসী। আবার জিজ্ঞাসা করেন—কি পড় মা? এবার মেয়েটি কিছুক্ষণ ভেবে উত্তর দিল—দ্বিতীয় ভাগ। সেই কথা শুনে তিনি বেশ গম্ভীর ভাবে বললেন—'ব্রেশ, ব্রেশ।'

এখন হয়েছে কি, সেই মেয়েটির ডাক নাম ছিল 'বেজা'। তার বাড়িতে বলেছিল—কেউ নাম জিজ্ঞাসা করলে ভাল নাম বলতে হয়। তাই মেয়েটির ধারণা হল—চলতি নাম 'বেজাকে' 'র'-ফলা দিয়ে ভাল নাম 'ব্রজ' হয়েছে—সেই জন্য দ্বিতীয়তে 'র'-ফলা দিয়ে দ্বিতীয় ভাল নাম করে দিলে। ভূদেববাবু রহস্য বুঝতে পেরে তিনিও 'র'-ফলা দিয়ে উত্তর দেন 'ব্রেশ, ব্রেশ'।

*

কবি নবীন সেনের পিতার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁর বিশ্বাস তাঁর মতো বাংলা ভাষা ভু-ভারতে কেউ জানে না। তিনি বিদেশে চাকরী করতেন, দেশে ফিরলেই কিশোর নবীনকে ভাষা নিয়ে বড় জ্বালাতন করতেন। পথে ঘাটে যেখানে তাঁকে পেতেন সেখানেই একটা না একটা প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতেন। একদিন নবীন সেন খেলতে যাচ্ছেন, পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। অমনি প্রশ্ন—'সন্ধি' কাকে বলে? যদি উত্তর না দিতে পার, তবে কানমলা খাবে।

নবীন সেন দেখলেন, ভদ্রতা আর রাখা যায় না। উত্তর দিলেন--তার নাম সন্ধি, যা কর্ণের সঙ্গে করের সংযোগ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গে বারুদ পড়ল। তিনি সেদিন নবীনকে 'বেল্লিক' উপাধিতে ভূষিত করেন।

*

স্বনামধন্য মতিলাল শীল কৃষ্ণকায় এবং দেখতে মোটেই সুশ্রী ছিলেন না।

মতিলাল শীলের বাড়িতে একদিন গঙ্গাধর তর্করত্ন মশাই এসে উপস্থিত। তিনি সে সময় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক। মতি শীলের কাছে সকালে যাঁরা এসেছিলেন, তাঁরা বিদায় গ্রহণ করার পর মতি শীল তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—পণ্ডিত মশাই, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

গঙ্গাধর বললেন—আমার জন্য কোনও কিছুই করতে হবে না। যে কাজের জন্য এসেছিলুম সে কাজ হয়ে গেছে।

মতি শীল বললেন—সে কি কথা, এমন কি কাজ যা আমার অজান্তে এখানেই হয়ে গেল। তাঁর মনে কৌতূহল হল, তিনি বললেন—কী কাজ হয়ে গেছে আমাকে বলবেন?

গঙ্গাধর বললেন—বলা কি উচিত হবে ?

মতিলাল—কেন, বলুন না।

গঙ্গাধর বললেন—আমার ধারণা ছিল, আমার চেয়ে কুৎসিত পুরুষ এ দুনিয়ায় কেউ নেই, আমার চেহারা কালো, রোগা, কুশ্রী। যখনই আয়নার দিকে চেয়ে দেখি, তখনই মনটা খারাপ হয়ে যায়। একদিন মনমরা হয়ে বসে আছি, এমন সময় আমার এক বন্ধু বললেন—ভাই, তুমি নিজের চেহারার জন্য অমন মনমরা হয়ে থাক কেন ? একবার মতি শীলকে দেখে এস, তা হলেই মনে বল পাবে।

তাই আজ তোমাকে দেখতে এলুম। দেখলুম আমার মতো সুপুরুষ এই দুনিয়ায় আর এক জন আছে। যখনই নিজের চেহারা দেখে খারাপ লাগবে তখনই তোমায় দেখে যাব। বাপু তুমি দীর্ঘজীবী হও।

এই বলে পণ্ডিত প্রস্থান করলেন।

*

রানাঘাটের জমীদার শ্রীগোপাল পাল চৌধুরীর এত বিরাট বপু ছিল যে কোথাও যেতে হলে তাঁকে হস্তিপৃষ্ঠে যেতে হত। তিনি একবার নিমন্ত্রিত হয়ে হস্তিপৃষ্ঠে তাঁর প্রতিবেশী জমীদারের গ্রামে যান। তখন রানাঘাটের পাল চৌধুরীদের খুব নাম ডাক। তাই শ্রীগোপাল বাবুকে দেখবার জন্য পথের স্থানে স্থানে লোক সমাগম হয়েছিল। প্রতিবেশী জমীদারের হাতি ছিল না। আর পথের ধারে লোক সমাগম দেখে শ্রীগোপালবাবু একটু ঠেস দিয়ে তাঁর বন্ধুকে বললেন—কি হে, তোমাদের গ্রামের লোক আগে কি কখনও হাতি দেখেনি, যে এত লোক জমেছে ?

প্রতিবেশী জমীদার বললেন—হাতি এরা খুবই দেখেছে, কিন্তু হাতির ওপরে হাতি এই প্রথম দেখছে বলেই এত ভীড়।

শেষে উভয়ের বাক্‌পটুতায় উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলেন।

*

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই খুব রসিক লোক ছিলেন। তাঁর গৃহিনীও সুরসিকা। শাস্ত্রী মশায়ের লেখা-পড়ার সময়ে কখনও কখনও গৃহিনী এসে সংসারের কথাবার্তা সুরু করতেন, তাতে শাস্ত্রী মশায়ের অনেক সময় কাজের ব্যাঘাত ঘটত। তাই একদিন তিনি যাত্রা অভিনয়ের মতো হাত নেড়ে বলেছিলেন—

"লিখিতে পড়িতে শিখিতে দিলে কই ?
বিবা'বধি নিরবধি জানি না আর তোমা বই ॥"

শাস্ত্রী মশাই বেশ তোয়াজ করে আহার করতে ভাল বাসতেন। গৃহিনী কিন্তু স্বহস্তে সুব্যঞ্জনাদি রেঁধে খাওয়াবার সময় পেতেন না। তাই নিয়ে একদিন গৃহিনীর কাছে অনুযোগ করলে তিনিও যাত্রা অভিনয়ের মতো হাত নেড়ে বললেন--

"রাঁধিতে বাড়িতে শিখিতে দিলে কই,
বিবা'বধি নিরবধি জানি না আর আঁতুর বই ॥"

*

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কারমাইকেল অধ্যাপক দেবদত্ত ভাণ্ডারকার একদিন বক্তৃতাকালে বলেন যে তক্ষশীলা নগরে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল একখানি নতুন রজতপত্র (silver scroll) আবিষ্কার করেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের শিলালিপি-পাঠক (epigraphist) তা পড়ে বলেছেন—উহা একটি পুরাণের অংশ ওতে নিম্নলিখিত ঘটনাটি লেখা আছে—

"একদা রম্ভা, ঊর্বশী বা মেনকা ইন্দ্রের সভায় নাচ করছিলেন। সেই সভায় দুর্বাসা ও সরস্বতী উপস্থিত ছিলেন। যে অপ্সরা নৃত্য করছিলেন, তাঁর নৃত্যের কিঞ্চিৎ দোষ ঘটায় সরস্বতী তাই দেখে অবজ্ঞায় হেসেছিলেন। তা দেখে দুর্বাসা ক্রুদ্ধ হয়ে সরস্বতীকে শাপ দেন—"তুই কলিযুগে গঙ্গাতীরে ভবানীনগরে দীর্ঘ গুম্ফযুক্ত হয়ে জন্মগ্রহণ করবি।" অতএব কলিযুগে গঙ্গাতীরে ভবানীনগরে দীর্ঘ গুম্ফযুক্ত সরস্বতী উপাধিধারী যে পুরুষ কলকাতার বিদ্যাপীঠের সর্বাধিকারী তিনি কমলদলবাসিনী শুভ্রাভা দেবী বীণাপাণির পূর্ণ অবতার।

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কাহিনীটি শুনে তাঁর মত প্রকাশ করেন—

"যে ঋষি শাপ দিয়েছিলেন তিনি দুর্বাসা নন, ভরদ্বাজ। অভিসম্পাৎ ছিল মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করা, কিন্তু সরস্বতী অভিশপ্তা হয়ে করুণ অনুনয় বিনয় করলে ঋষি তাঁকে বললেন—আচ্ছা, তোমাকে এই বর দিলুম যে অজ্ঞানপূর্ণ মর্ত্যলোকে তুমি বিদ্যা বিস্তার করবে।

দেবী প্রত্যুত্তরে বলেন—ঠাকুর, আমি স্ত্রীলোক, আমি তা কিরূপে সমর্থ হব ?

তখন ঋষিবর বলেন—তবে আমার বরে তুমি পুরুষ হবে ও আমারই বংশে জন্মগ্রহণ করবে।"

*

স্যর আশুতোষ মধুপুর থেকে কলকাতায় ফিরছেন। ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরায় তিনি উঠলেন। কামরায় অপর একজন সহযাত্রী ছিলেন সাহেব। সাহেব সেই কামরায় কোনও নেটিভের উপস্থিতি পছন্দ করেন না তা নানা ভঙ্গিতে দেখান। আশুতোষ তা গ্রাহ্য না করে নিজের বার্থে শুয়ে নিদ্রা যান। ঘুম ভাঙ্গার পর লক্ষ্য করলেন তাঁর জুতো জোড়াটা নেই। তিনি ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। দেখলেন সাহেবও নিদ্রা গেছেন বা নিদ্রার ভান করে আছেন। তাই কাল বিলম্ব না করে হুক থেকে সাহেবের কোটটি খুলে জানালা দিয়ে গলিয়ে ফেলে দিলেন।

কিছুক্ষণ পরে সাহেব ঘুম থেকে উঠে যথাস্থানে কোট দেখতে না পেয়ে ক্রুদ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার কোট কোথায়?

আশুতোষ গম্ভীর ভাবে বললেন—তার আগে আমি জানতে চাই, আমার জুতো কোথায়?

সাহেব বললে, তোমার জুতো ট্রেনের বাইরে হাওয়া খেতে গেছে। আশুতোষও উত্তর দিলেন—তোমার কোট আমার জুতো খুঁজে আনতে গেছে।

নেটিভের স্পর্ধা দেখে সাহেব থ।

॥ নয় ॥

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আইনজীবী ও রসসাহিত্যিক। 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রে লিখতেন। তিনি খাঁটি বাঙালী। বাংলাদেশকে জানতেন, বাঙালীকে চিনতেন, বাঙালীর রোগ ধরতে পারতেন আর 'রোজা' সেজে রোগের ওষুধ দিতেও পারতেন। তিনি অজস্র ব্যঙ্গ কবিতা ও ছড়া লিখে বিলিতি বাতিকগ্রস্ত বাঙালী বাবুদের অনেক রোগ সারিয়ে দিয়েছিলেন।

দু পয়সার কাগজ বঙ্গবাসীর যখন খুব প্রতিপত্তি তখন কোন ব্যাপারে 'বেঙ্গলী' কাগজের সম্পাদক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে আসেন। সে সময়ে ইন্দ্রনাথ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ চলে গেলে ইন্দ্রনাথ যোগেনবাবুকে বললেন—আপনার দু পয়সার কাগজের এমন প্রতিপত্তি হয়েছে যে, ইংরেজি কাগজের সম্পাদকরাও আপনার মতামত জানতে বাড়ি পর্যন্ত ছুটে আসেন। এর জন্য আপনার একটা 'কালো' পাথরের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হওয়া উচিত।

যোগেন্দ্রনাথ ইন্দ্রনাথের এই রসময় ইঙ্গিতে হাসলেন—কারণ কাল পাথরের উল্লেখ তাঁর দেহের বর্ণের প্রতি ইঙ্গিত ছিল।

*

আর একদিন ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গবাসী' কার্যালয়ে বসে আছেন। আরও অনেকে আছেন। এমন সময় এক যুবক এসে ইন্দ্রনাথের কাছে বসলেন। তার কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—মশাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ইন্দ্রনাথ—হ্যা, পারবে কি?

যুবক—বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসগুলির মধ্যে কোন খানি আপনার মতে শ্রেষ্ঠ?

ইন্দ্রনাথ তৎক্ষণাৎ গম্ভীর হয়ে বললেন—'কৃষ্ণ-চরিত্র' নামে সম্প্রতি বঙ্কিমবাবুর যে উপন্যাসখানি বেরিয়েছে—সেখানি সর্বশ্রেষ্ঠ।

এই উত্তর শুনে সকলে হেসে উঠলেন। যুবক অপ্রতিভ হল।

*

ইন্দ্রনাথ বাল্যকালে বাংলা লেখাপড়া ভাল করে শেখেন নি। যখন কৃষ্ণনগর কলেজে সেকেন্ড ক্লাসে পড়েন তখন পরীক্ষার সময় বড় বিব্রত হয়েছিলেন। বাংলা পরীক্ষার সময় পরীক্ষক জিজ্ঞাসা করলেন—'শব' বানান কর।

তিনি বললেন—'শ' আর 'ব'। কোন শ তালব্য, দন্ত্য বা মূর্ধণ্য তা তিনি শেখেন নি। পরীক্ষক তা বুঝতে না পেরে আবার জিজ্ঞাসা করলেন—কোন্ 'শ,' তিনি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন—কোন 'শ,' 'শ' আর কি?

পরীক্ষক এক প্রস্থ পরাস্ত হলেন।

আবার জিজ্ঞাসা করলেন—'শব' মানে কি?

উত্তর দিলেন—'তামাম'।

পরীক্ষক বললেন—বাংলা শব্দে বল।

উত্তর বিলকুল।

পরীক্ষা সুসম্পন্ন হল। তিনি পাশ করলেন।

*

ইন্দ্রনাথ আদালতে মোকর্দমা করতে করতে রসিকতার সুযোগ কখনও নষ্ট করতেন না। সেদিন আদালতে তহবিল তছরুপের মামলা।

প্রতিবাদী পক্ষের উকীল ইন্দ্রনাথ আদালতে দেখার জন্য বাদী-পক্ষ থেকে একখানি খাতা দাখিল করার আবেদন করলে পরদিন অপর পক্ষের উকীল মশাই ক্রোধভরে বহু খাতা নিয়ে আসেন।

খাতার স্তূপ দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বললেন—আমি একটু বিশল্যকরণী চেয়েছিলুম কিন্তু আমার সুপণ্ডিত বন্ধু একেবারে গোটা গন্ধমাদন এনে হাজির করেছেন। (তুলনা—হনুমানের সঙ্গে)

আদালতে হাসির রোল উঠল।

*

আর একদিন কোনও এক মোকদ্দমায় পদ্মমণি নামে এক বারাঙ্গনা সাক্ষ্য দিল। তারপরেই একজন পুরুষ সাক্ষী দিতে এলে সে পক্ষের উকীল তার নাম, পেশা, জিজ্ঞাসা করায় ইন্দ্রনাথ এ পক্ষ থেকে বলে ওঠেন—উনি পদ্মমণির অলি (ওলি)।

*

এক তন্তুবায়-হাকিমের এজলাসে বিষম গণ্ডগোল হচ্ছে দেখে ইন্দ্রনাথ হাকিমকে বললেন—এযে একেবারে সুতোহাটার গোল দেখছি।

রায় বেরুলে—ইন্দ্রনাথ তা শুনে বললেন—বোনা হয়েছে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না।

বলা বাহুল্য সে রায় টেকেনি।

*

এক সময়ে হাইকোর্টের এক প্রসিদ্ধ উকীল তাঁর পিতার কাছে টাকা পাওনা বলে নালিশ করে। প্রতিপক্ষের উকীল হন ইন্দ্রনাথ।

একে হাইকোর্টের উকীল তায় বাপের নামে পাওনা টাকার নালিশ। আদালতে লোকে লোকারণ্য।

এমন সময় 'পুত্র' উপস্থিত হয়ে আসন গ্রহণ করলে ইন্দ্রনাথ অতি সমাদরে তাঁকে বললেন—আসুন, আসুন, আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ, শাস্ত্রে বলে পিতৃঋণ কেউ শোধ করতে পারে না। আপনি তো ঋণ শোধ করেছেন—উপরন্তু আপনার পাওনা—আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ তাই আজ আপনাকে দেখবার জন্যে আদালতে লোকে লোকারণ্য।

*

একদিন পঞ্চানন্দের (ইন্দ্রনাথের) বৈঠকখানায় বাবুদের প্রবেশ।

পঞ্চানন্দ—আসুন, আসুন, বড় সৌভাগ্য, ভালো করে বসুন না।

বাবু—থাক, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমরা বেশ বসছি।

পঞ্চানন্দ—কি মনে করে আসা হয়েছে?

বাবু—কিছু ভিক্ষা করতে আসিনি, এমনি দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসা।

পঞ্চানন্দ—ভালো, ভালো। আপনার নাম?

বাব্—কার্ড তো পাঠিয়ে দিয়েছি।

পঞ্চানন্দ—সে কেমন বুঝতে পারলুম না যে?

বাব্—বুঝতে পারলেন না? হোঃ হোঃ হোঃ

পঞ্চানন্দ—ভয় কি বাবু, এখানে কোনও ব্যাটা আসতে পারবে না, আপনি নির্ভয়ে নামটা বলুন।

বাব্—ভালো গ্রহেতে পড়লুম এসে দেখছি, আমার নাম সুদর্শন ঘোষাল, এম এ।

পঞ্চানন্দ—শ্রীহীন করলেন যে, যাক্ আপনার পিতার নাম?

বাব্—মাফ করবেন, ভদ্রলোক মনে করে দেখা করতে এসেছি, কুলজী আওড়াতে আসিনি।

*

ইন্দ্রনাথের বৈঠকে রসালাপ হচ্ছে।

রসময়—কেমন ভাই, তোমার পরিবার কেমন?

রামনিধি—আর ভাই, সে সব আর জিজ্ঞাসা করো না। দু তিন হাজার টাকা ব্যয় হয়ে গেল, কিন্তু পরিবারের ব্যারামের কিছু কম দেখা যাচ্ছে না।

রসময়—বল কি? দু তিন হাজার, তা 'রিপু'র কাজে এত খরচ করার চেয়ে নতুন দুটো বে করা ভালো।

রামনিধি—তোমার মতো বিষয় বুদ্ধি থাকলে এত কষ্ট পাব কেন?

*

ইন্দ্রনাথ উকীলকে তিন জাতীয় বলেছেন—

প্রথম, ময়ূর—এরা পুচ্ছ বলে অর্থাৎ প্যাখম দেখিয়ে খান; ইতর লোকে একে বলে পসার, ক্ষমতা, সময় অথবা কপাল। এদের ভাবনার কারণ নেই, যতদিন প্যাখম আছে, ততদিন চিড়িয়াখানায় এদের মান যাবার নয়।

দ্বিতীয়, কাক—এরা ছেলে-পিলের ঠোকা হতে মুড়িটা, লাড়ুটা, অথবা আস্তাকুড়ে এঁটোটা-কাঁটাটা খুটে খায়, এদের কেউ যত্ন করতে নেই, কারও প্রত্যাশাও নেই, তথাপি একরকমে পেটটা ভরে, জীবনটা কাটে। এদেরও ভাবনা নেই।

তৃতীয়, কোকিল—এরা পরের বাসায় প্রতিপালিত হয়, পরের আহার খেয়ে প্রাণ বাঁচায়। সময় পেলে কুহু কুহু করে, আর বসন্ত ও বিরহীর কাছে নামে একটু খাতির পায়, কাজে পায় না, বরং গালি খায়। ভাবনা এদের জন্যে।

*

একদিন কথা উঠল—কোন পাশ্চাত্যে শিক্ষিত বাবু বললেন—বঙ্কিমবাবু লিখেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রেই যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁর লেকচার দিয়েছিলেন, তা তিনি বিশ্বাস করেন না।

ইন্দ্রনাথ বললেন—একথা ঠিক, কারণ তখন গীতার ইংরেজি অনুবাদ হয়নি, এ অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুন তাড়াতাড়ি তা বুঝবেন কেমন করে?

॥ দশ ॥

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'বঙ্গবাসী'র সম্পাদক। দ্বিজেন্দ্রলাল একদিন হ্যাটকোট পরে পাঁচকড়িবাবুর বাড়িতে এসে হাজির। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ঘরে ঢুকেই একবার ইন্দ্রনাথের দিকে ও একবার পাঁচকড়িবাবুর দিকে চেয়ে বললেন—তোমার এখানে আসতে ভয় করে। তুমি 'বঙ্গবাসী'র এডিটর। গোঁড়াদের সর্দার।

ইন্দ্রনাথ অমনি মাথা নেড়ে বললেন—উঁহু, পাতিদের সর্দার। কমলালেবু সিলেটে জন্মায়, সেই কমলার চাষ বাঙলার মাটিতে ফললে, গোঁড়ায় পরিণত হয়। পাঁচু এদেশেরই, সুতরাং 'পাতি'—বড় জোর শ্রদ্ধা করে 'কাগজী' বলতে পার।

দ্বিজেন্দ্রলাল অমনি হাসতে হাসতে বললেন—আপনার নাম ইন্দ্রনাথ বন্দ্যো, কেমন—কারণ এমন উপমাযুক্ত রসিকতা এক ইন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর নেই।

ইন্দ্রনাথও হেসে বললেন—তোমায়ও চিনেছি, তুমি দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্গবাসীতে, 'Reformed Hindoos,' 'বিলেত ফের্তা ক'ভাই'। কেমন?

রসিকে রসিকে পরিচয় হয়ে গেল।

*

কবি এবং নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যিনি তৎকালে ডি এল রায় নামে পরিচিত ছিলেন, তিনি একবার বন্ধুবান্ধবদের বিরাট ভোজ দেন। ভোজটা হয় তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। তাঁর শ্বশুর ছিলেন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। শ্যালক জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারও হোমিওপ্যাথ। এই উপলক্ষে যে নিমন্ত্রণ চিঠি পাঠিয়েছিলেন তা এই—

"যাঁহার কুবেরের ন্যায় সম্পত্তি, বৃহস্পতির ন্যায় বুদ্ধি, যমের ন্যায় প্রতাপ, এ হেন আপনি আপনার ভবনের নন্দনকানন ছাড়িয়া, আপনার পদ্মপলাশনয়না

ভামিনী সমভিব্যাহারে, আপনার স্বর্ণশকটে অধিরূঢ় হইয়া এই দীন অকিঞ্চিৎকর অধমদের গৃহে, শনিবার মেঘাচ্ছন্ন অপরাহ্ণে আসিয়া যদি শ্রীচরণের পবিত্র ধূলি ঝাড়েন—তবে আমাদের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার হয়। ইতি শ্রীসুরবালা দেবী। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মজুমদার।"

নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে অনেকেই কৌতুকময় উত্তর দিয়েছিলেন, তার মধ্যে দুখানি পত্রের উল্লেখ করছি—

একখানি চিঠি প্রসিদ্ধ শিকারী ও ব্যারিস্টার এবং দ্বিজেন্দ্রলালের অন্যতম শ্যালিকাপতি কুমুদ চৌধুরী মশায়ের—

"ডানাকাটা পরী
গাঁজা গুলি আবকরী,
হোমা-পেত্নী ধন্বন্তরি
ত্রয়ে নমস্কারি
এত কহে পায়ে ধরি
শ্রীকুমুদ চৌধুরী ॥

দ্বিতীয়টি প্রসিদ্ধ কবি ও দার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"ন চ সম্পত্তি ন বুদ্ধি বৃহস্পতি,
যমঃ প্রতাপ চ নাহিক মে।
ন চ নন্দনকানন, স্বর্ণসুবাহন,
পদ্মবিনিন্দিত পদ্মযুগ মে।
আছে সত্যি পদরজ বত্তি,—তাও পবিত্র কি জানিত নে,
চৌদ্দ পুরুষ তব ত্রাণ পায় যদি, অবশ্য ঝাড়িব তব ভবনে।
কিন্তু—
মেঘাচ্ছন্ন শনি অপরাহ্ণে যদি গুরু বাধা ঘটে মে।
কিম্বা যদ্যপি সহসা চুপি চুপি প্রেরিত না হই পরধামে ॥"

*

একদিন দ্বিজেন্দ্রলাল 'রিজেন্ট পার্ক'র ভেতর দিয়ে আসছেন—এমন সময় দেখলেন এক পাদরী মহা চিৎকারে বক্তৃতা দিচ্ছেন—চারদিকে তাঁর লোক ঘিরে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য যেমন দাঁড়িয়েছেন—অমনি পাদরী গম্ভীর স্বরে বললেন—And you, the Devil is staring in the face (শয়তান তোমার মুখের দিকে চেয়ে আছে)।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল আরও গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলেন—yes, you are (হ্যাঁ, সে তুমিই)।

মুখের মতো জবাব শুনে লোকেদের মধ্যে হাসির ধুয়া পড়ে গেল।

*

রজনীকান্ত সেন বাংলা সাহিত্য-সমাজে 'কান্তকবি' বলে সুপরিচিত। গানে কবিতায় হাসির গানে কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পরেই তাঁর স্থান।

একদিন কবি রসময় লাহা তাঁর সদ্যোপ্রকাশিত 'ছাইভস্ম' নামে বইখানি কান্তকবি রজনীকান্তকে উপহার দেন। রজনীকান্তও তাঁর 'অমৃত' নামে কবিতার বইখানি তাঁকে উপহার দিয়ে বললেন—'ছাইভস্ম' দিয়ে 'অমৃত' নিয়ে যান।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন লাহা মশাই তাঁর রচিত 'আরাম' বইখানি রজনীকান্তকে উপহার দিলেন। রজনীকান্ত তখন রোগ-শয্যায়। বইখানি হাতে নিয়ে তিনি পরিহাস করে বললেন—আমার এই ব্যারামে 'আরাম' দিলেন বেশ।

*

রজনীকান্তের বিয়ের পর তাঁর স্ত্রী ২।৩ বছর শাশুড়ীকে 'মা' বলে ডাকতেন না। 'আপনি' 'আসুন' 'বসুন' এইভাবে কথা বলতেন। সেই জন্য কবি-জননী একদিন দুঃখ করে বলে ছিলেন—আমার একটি মাত্র পুত্রবধূ সেও আমাকে 'মা' বলে না।

রজনীকান্তের কানে একথা পৌঁছল। তিনি স্ত্রীকে অনেক করে বোঝালেন তবুও কোনও সন্তোষজনক উত্তর পেলেন না। হুকুম করলে পাছে হিতে বিপরীত হয় তাই তিনি এক কৌশল অবলম্বন করলেন।

একদিন রজনীকান্ত সপরিবারে নৌকো যোগে ভাঙাবাড়ি থেকে রাজশাহীতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকোটা কাৎ হয়ে গেল! রজনীকান্ত জলে পড়ে গেলেন। মাঝিরা হৈ হৈ করে উঠল। 'বাবু ডুবে গেল, বাবু ডুবে গেল বলে চীৎকার করে দু-একজন মাঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। জলে বাবুর কোনও পাত্তা নেই। কবি-জায়া উন্মাদের মতো শাশুড়ীর পা দুটি চেপে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'মা, কি হবে মা, মা কি হল মা'।

রজনীকান্ত কিন্তু নৌকোর পাশেই ছিলেন। দু-একটা ডুব দিয়েই নৌকোয় উঠে হাসতে হাসতে বললেন—কেমন, আর তো 'মা' বলতে মুখে আটকাবে না, এবার থেকে 'মা' বলে ডাকবে তো?

তখন সকলে তাঁর পূর্ব-পরিকল্পিত মতলবের কথা শুনে হেসে উঠল। আর তাঁর স্ত্রী লজ্জায় মায়ের পা দুটি জড়িয়ে ধরে বসে রইলেন।

*

কান্তকবি রজনীকান্তকে একদিন রাম ভাদুড়ী মশাই বললেন—রজনী, বিয়েতে গেলে, দিলে কি? খেলে কি? পেলে কি?

রজনীকান্ত বললেন—দিলাম দৌড়, খেলাম আছাড়, পেলাম ব্যথা।

*

রজনীকান্ত আইনজীবী ছিলেন। তাঁর কাছে এক চাষী মক্কেল এসেছে।

জিজ্ঞাসা করলেন—বিয়ের সময় তোমার বয়স কত ছিল?

উত্তর—১৭ বছর।

রজনীকান্ত—তোমার স্ত্রীর তখন বয়স কত ছিল?

উত্তর—আজ্ঞে, ১৩।১৪ বছর।

—এখন তোমার বয়স কত?

—৩০ বছর।

—তোমার স্ত্রীর এখন বয়স কত?

—আজ্ঞে, সে তো প্রায় ৪৬।৪৭ বছর হবে।

রজনীকান্ত—সে কি গো, তোমার বউ হঠাৎ তোমার চেয়ে বড় হয়ে গেল—কেমন করে।

—আজ্ঞে, ঐ কথাটাই তো কোন ভদ্রলোককে আজ পর্যন্ত বোঝাতে পারলুম না—স্ত্রীলোকের বাড় যে বড় বেশী।

*

এক সময় রজনীকান্ত তাঁর কোন বন্ধুর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে গিয়েছিলেন। বর-কন্যা সমেত ফেরার পথে নব-বধূর প্রবল জ্বর হয়। বন্ধুটি তাঁর কাছে এসে বললেন—জ্বর ১০৩ হয়েছে। রজনীকান্ত হেসে বললেন—আগেও এক সতীন—এখনও ১০৩।

*

রজনীকান্ত কতকগুলি হাঁসের ডিম এনে রাজশাহীর বাড়িতে এক কুলুঙ্গীতে রেখে দেন।

পরদিন স্ত্রীর কাছে ডিম চাইলেন।

গৃহিনী বললেন—কোথায় রেখেছ?

রজনীকান্ত—উঁচুতে, পেড়ে আন।

*

রজনীকান্ত মুখে অনেক চুটকী গল্পও বলতে পারতেন। শুনুন—

রামহরি বলল—পণ্ডিত মশাই, আমার এক ছেলের নাম জগৎপতি, একজনের নাম সুরপতি, একজনের নাম নরপতি, একজনের নাম শচীপতি, আর এক জনের নাম লক্ষ্মীপতি। আর এক ছেলে হয়েছে—তার নাম মেলাতে পারছি না—

পণ্ডিত মশাই—কেন, এছেলের নাম রাখ ভগিনীপতি।

*

আদালতে উকিলদের সঙ্গে মাঝে মাঝে রসালাপ চলছিল। রজনীকান্ত বললেন—একটা রাখাল দুটো গরু নিয়ে যাচ্ছে—একটি মোটা আর একটি রোগা। একজন উকিল সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে রাখালকে জিজ্ঞেস করলেন—তোর ও গরুটা অত মোটা আর এ গরুটা এত রোগা কেন রে? খেতে দিস না নাকি? রাখাল উকিলবাবুকে বল্লে—আজ্ঞে তা নয়, মোটা গরুটা উকিল আর রোগাটা মক্কেল। রাগ করবেন না উকিলবাবু।

*

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'চৈতন্যলীলা' নাটকের অভিনয় দেখে একদল বৈষ্ণব গিরিশচন্দ্রের খুব ভক্ত হয়ে উঠল। তারা তাঁকে কিছুতেই ছাড়তে চায় না। দিন রাত্রি তাঁর আশে পাশে থাকে। কাজকর্ম সব বন্ধ। হতাশ হয়ে শেষে একদিন তাদের সামনেই গিরিশচন্দ্র মদ খেতে আরম্ভ করলেন।

তাই দেখে একজন বৈষ্ণব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—ও কি, মহাপ্রভুর চরণামৃত না কি?

গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে বললেন—না, মদ, খাবেন না কি আপনারা?

বৈষ্ণবদের দল সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল।

*

রসরাজ অমৃতলাল বসুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এক ভদ্রলোক থিয়েটারে গিয়ে তাঁর ঠিকানা চান। কোন অভিনেতা তাঁকে ঠিকানা দেন—১নং মৈত্র লেন।

তিনি ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে শ্যামবাজারের অলিগলি ঘোরেন। হদিশ পান না। অবশেষে অমৃতলালের নাম বলায় পল্লীস্থ কোনও ভদ্রলোক তাঁর বাড়ির হদিশ দেন। অমৃতলালের সঙ্গে দেখা হতেই তিনি বললেন—আপনার ঠিকানা খুঁজতে খুঁজতে বড় হয়রান হয়েছি, মৈত্র লেন আর খুঁজে পাই না, এযে দেখছি রামচন্দ্র মৈত্র লেন, তাও ১/২ নম্বর।

তাতে অমৃতলাল বললেন—কে আপনাকে ঠিকানা দিয়েছে?

ভদ্রলোক—থিয়েটারের কোনও এক অভিনেতা হবে।

অমৃতলাল—ঠিকই হয়েছে, জানেন তো অভিনেতারা আদ্দেক মুখস্থ করেন আর আদ্দেক থাকে প্রমটারের হাতে।

*

কেশব সেনের তখন প্রচণ্ড প্রভাব। যুবকদের চোখে তিনি আদর্শ পুরুষ। কেশবচন্দ্র চশমা পরতেন, ঘুমুতেনও চশমা পরে। কেশবচন্দ্রের দেখাদেখি অনেক যুবকও তখন সখের চশমা নিয়েছিল।

একদিন অমৃতলাল কেশবচন্দ্রকে বললেন—চশমা চোখে না দিলে কি স্বপ্নও দেখতে পারেন না।

কথা শুনে কেশবচন্দ্র মৃদু হাসলেন।

*

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন যখন ভারত বিখ্যাত হলেন—তখন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে বললেন—ভারত সরকারের উচিত আপনাকে 'কে সি এস আই' সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করা।

সেই কথা শুনে কেশবচন্দ্র বললেন—সেই উপাধি তো আমার আছে। আমি 'কেশবচন্দ্র সেন অফ ইন্ডিয়া' অর্থাৎ 'কে সি এস আই'।

*

এক ভদ্রলোক একখানি গীতিনাট্য লিখেছেন। ছাপাখানায় ছাপতে দেবার আগে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে দেখান। গিরিশচন্দ্র তা দেখে বললেন—এই গীতিনাট্যে সখী রাখনি কেন, নাচ হবে কেমন করে?

অমৃতলাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন—নাচ হবে বৈ কি?

গিরিশচন্দ্র—সখী নেই, নাচ হবে কেমন করে?

অমৃতলাল—সখী না থাক, যখন ছাপাখানার বিল আসবে তখন ওর বাবা ধেই-ধেই করে নাচবে।

*

রসরাজ অমৃতলালের 'তিলতর্পণ' নাটকখানি অভিনীত হবার পর গিরিশচন্দ্র হাসতে হাসতে অমৃতলালকে বললেন—আচ্ছা ভুনি (ডাকনাম), তুই বেশ বিষ ছড়াতে পারিস, কেমন?

অমৃতলাল উত্তর দিলেন—আমি আর বিষ কোথা থেকে পাব? আপনার কাছ থেকে ধার করে একটু আধটু ছড়াই।

অমৃতলালের তরুণ বয়সে একবার হাত ভেঙে গেছে। তখনকার প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বেরিনিকে ডাকা হল। বেরিনি হাতটা অস্ত্র করলেন। কলকাতায় এই প্রথম হোমিওপ্যাথির সার্জিক্যাল কেস।

ব্যান্ডেজ খোলার দিন বিদ্যাসাগর মশাই উপস্থিত ছিলেন। হাতটাকে সোজা করে বাঁধার জন্য ডাক্তার বেরিনি দুখান পিচবোর্ড চাইলেন।

রসরাজ হেসে বললেন—সেক্সপীয়রের মলাট ছিঁড়ে দিলে হয় না?

ডাঃ বেরিনি তেমনিভাবে জবাব দিলেন—Or the cover of the Bible may do.

*

অমৃতলালের সঙ্গে একবার বিপিনবিহারী গুপ্তের কথা হচ্ছে। কথা প্রসঙ্গে দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের কথা উঠল। কথাটি উঠতেই অমৃতলাল বললেন—লীলাবতী নাটকটি আমি পড়ি আমার বিয়ের দিন সকালে। পড়ার পরেই ভাবতে লাগলুম—আমার স্ত্রীটি কেমন হবে? লীলাবতী নাটকের সারদাসুন্দরীর মতো হলেই ভালো হয়। না হয় তো লীলাবতীর মতো। কিন্তু পরে দেখলুম আমার স্ত্রীটি সারদাসুন্দরীও নন, লীলাবতীও নন, একটি চেলির পুঁটুলি মাত্র।

*

হেমচন্দ্রের 'ভারত-বিলাপ' কবিতাটির এক লাইন হল—"ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর"।

অমৃতলাল এই লাইনটি বদলে গাইতেন—"ভয়ে ভয়ে গাহি কি গাহিব আর।"

হেমচন্দ্র এই কথা শুনে বললেন—বেশ করেছ, যখন ওসব লিখি, তখন কি আমার মাথার ঠিক ছিল।

অমৃতলাল বললেন—আপনার কেন ও অবস্থায় স্বয়ং মিলটনেরও মাথার ঠিক থাকত না।

*

অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী যেমন নাট্যরসিক ছিলেন, তেমনি কৌতুক করতে পারতেন।

মিনার্ভা থিয়েটারের সামনে একদিন অর্ধেন্দুশেখর গম্ভীর মুখে বসে আছেন। এক পরিচিত ভদ্রলোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি মশাই, এত কি ভাবছেন?

অর্ধেন্দুশেখর জবাব দিলেন—না, এমন কিছু ভাবছি না, কী ভাবব, তাই ভাবছি।

*

আর একদিন চায়ের দোকানে বসে অর্ধেন্দু দুটো অর্ধসিদ্ধ হাঁসের ডিমের অর্ডার দেন। হোটেলের বয় ডিম নিয়ে এল।

অর্ধেন্দু জিজ্ঞেস করলেন—ডিমের দাম কত?

বয় বললে—দু-আনা।

অর্ধেন্দু বললেন—দু-আনা, এত দাম কেন? ডিমের জোড়া তো চার পয়সা।

বয় বললে—আজকাল ডিম বড্ড মাগ্যি হয়েছে।

অর্ধেন্দু বললেন—কেন? হাঁসেরা কি আজকাল পরমহংস হয়ে উঠেছে না কি?

*

এক সাময়িকপত্রে Bengalee Babu of Devcarson নামে একটি কবিতা প্রকাশ হয়েছিল (কার লেখা স্মরণ নেই):

I am a very good Bengalee Babu
I keep my shop at Radhabazar,
I live in Calcutta eat my Dal-vat
And smoke my Hookka…"

অর্ধেন্দুশেখর উত্তর দিয়েছিলেন—

"হাম বড়া সাব হায় দুনিয়া মে,
None can be compared হামারা সাথ।
'মিস্টার মুস্তাফী' name হামারা
চাটগাঁওমে মেরা বিলাত॥
কোট পিনি, প্যান্টুলন পিনি,
পিনে সেরা ট্রাউজার—'
Every two years New Suit পিনি
Direct from Chadney Bazar
Dirty nigger hate হামারি
বড় ময়লা আছে ছোঃ ছোঃ। ইঃ

*　　*　　*

চিংড়ি মাছ and কাঁচা কেলা my খানা প্যাকাও
Charpoy was my পালংপোষ and মোড়া
was my royal seat."

*

কবি দেবেন সেনও কম রসিক ছিলেন না—একদিন খেতে বসে গৃহিনীকে কচু মুলোর সুক্ত পরিবেশন করতে দেখেই বলে উঠলেন—

"ঝোলে কচু, টকে কচু, কচু মুলোর সুক্ত।
কচুর ঘণ্ট, বিউলির ডাল তাও কচুযুক্ত॥
রাত্রি কালে গানের সময় দিলে কেন ফাঁকি,
সব রকম কচু, কেবল কচুপোড়া বাকি॥"

এটা পরে তিনি 'দগ্ধকচু' বইয়ে সংযোগ করেন।

॥ এগার ॥

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গৃহে 'বিচিত্রা' সভার অধিবেশন। কিছুদিন যাবৎ সভ্যদের বাইরে রাখা জুতো চুরি যাচ্ছিল।

শরৎচন্দ্র সভায় উপস্থিত হলেন। কিন্তু জুতো চুরি যাবার ভয়ে তিনি চুপি চুপি একটা খবরের কাগজে জুতোটা মুড়ে বগলে করে রবীন্দ্রনাথের কাছে এসে বসলেন।

এদিকে শরৎচন্দ্রের কাজ দেখে কোন এক সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথকে গোপনে সেই খবরটি দিলেন।

রবীন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে বললেন—ও শরৎ, তোমার বগলে ওটা কি?

শরৎচন্দ্র আমতা আমতা করতে লাগলেন।

রবীন্দ্রনাথ—ও 'পাদুকাপুরাণ' বুঝি?

চারদিকে চাপা হাসির কলরব।

*

রবীন্দ্রনাথ তখন মংপুতে মৈত্রেয়ী দেবীর বাড়িতে। বৈঠকী আলাপ চলতে চলতে হঠাৎ কবি দুহাত দুকানের ওপর চাপা দিয়ে বললেন—শিগ্‌গির বল এটা কি?

কোথাও কিছু নেই, এ কি প্রশ্ন, সকলে চুপচাপ। একজন বললেন—কি আবার?

-হ্যাঁ, অত চট করে যদি বলবে তবেই হয়েছে, ভেবে বল। সকলেই চুপ

রবীন্দ্রনাথ—এটা চাপকান।

*

রবীন্দ্রনাথ একবার মধুর ওপর এক কবিতা লিখেছিলেন। মৈত্রেয়ী দেবী প্রবাসীতে সেটা বার করে দেন। একদিন ডাকের সঙ্গে এল এক বোতল মধু।

রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে মৈত্রেয়ী দেবীকে বললেন—তোমার মধুর কবিতাতে কেবল মধুই আসছে, মধুই আসছে।

পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাই শুনে বললেন—তার চেয়ে আপনি চাল-ডালের ওপর যদি কবিতা লিখতেন—চাল-ডাল আসতো, সংসারের অনেক খরচ বাঁচতো।

ডাঃ সেন থাকেন চুপচাপ। এদিকে বস আছে। বললেন—গুরুদেব যদি তার চেয়ে বধূর ওপর কবিতা লিখতেন, তবে বধূ আসতে পারতো?

*

রবীন্দ্রনাথ—বনমালী, খাওয়া-দাওয়া চলছে কেমন?

বনমালী—আজ্ঞে, তা ভালোই চলছে, দিদিমণি আবার আমায় দুধ খাওয়াচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ—দুধ খাওয়াচ্ছেন কেন? তার চেয়ে দুধ মাখালেই পারতেন। খেয়ে তো রঙের বেশি উন্নতি হচ্ছে না।

অসুস্থ রবীন্দ্রনাথ। চিকিৎসার আয়োজনের কোনও ত্রুটি নেই। বড় বড় ডাক্তার আসছে, দেখছে, যাচ্ছে। শেষকালে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করলেন—আমাকে নিয়ে ডাক্তাররা বেজায় বিপদে পড়েছে। হার্ট দেখে, লাংস দেখে, কোথাও কোন দোষ খুঁজে পায় না · ওদের ভারি মন খারাপ। নির্মলা মহলানবিশ কবির কাছে ছিলেন—তিনি বললেন—মন খারাপ হবে কেন? এতে তো খুশি হবারই কথা।

উত্তরে কবি বললেন—তুমি কি বোঝ না। রুগী আছে, রোগ নেই। ওরা চিকিৎসা করবে কার? এতে ওদের মন খারাপ হবে না?

*

শান্তিনিকেতনের পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মশাই কিছুদিন নিরামিশাষী ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁর একবার অসুখ হয়। সেই অসুখে চিকিৎসক তাঁকে মাছের

ঝোল পথ্য দিয়েছিলেন। তিনি কিছুতেই খেতে রাজি নন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে রোগের ঔষধরূপে মাছের ঝোল খেতে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ তিনি ঠেলতে পারলেন না। শাস্ত্রী মশাই যেদিন পথ্য করবেন—সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ এসে হাজির হলেন। তিনি এসেই বললেন—আজ উৎসব। শাস্ত্রী মশাই 'মীনাসনে' বসবেন।

*

রবীন্দ্রনাথ একদিন ছবি আঁকছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বিধুশেখর শাস্ত্রী একমনে আঁকা দেখছেন। জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুদেব, আপনি এত কাজকর্ম লেখাপড়ার ভেতরে আঁকাটা কি ভাবে শিখলেন ?

কবি গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেন—সরস্বতী প্রথমে আমাকে নিজের লেখনীটি দয়া করে দিয়েছিলেন, তারপর অনেক দিন কেটে গেল। তিনি ভাবলেন, না কাজটা তো সম্পূর্ণ হয় নি, সম্পূর্ণ করতে হবে, তাই তিনি নিজের তুলিকাটিও আমাকে দান করে গেলেন।

প্রশ্নকর্তা নির্বাক।

*

রবীন্দ্রনাথ তখন রাজশাহীতে। বন্ধুবর লোকেন পালিতের অতিথি। সেখানে আছেন প্রমথ চৌধুরীও। কিছুদিন পরে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায় এসে হাজির হলেন। আর অক্ষয় মৈত্রেয় তো রাজশাহীর লোক। রোজ সন্ধ্যে বেলায় বৈঠক বসত, খোসগল্পও চলত। এমন জিনিস ছিল না, যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা হত না। রোজই তুমুল তর্ক বাধতো প্রমথ চৌধুরী আর লোকেন পালিতের সংগে। কোন বিষয়েই দুজনের মতের মিল ছিল না। লোকেনবাবু কিছু দিন 'মিল'কে নিয়ে পড়লেন। তিনি প্রায়ই মিলের কঠিন কঠিন বইগুলি পড়ে শোনাতে লাগলেন। কিন্তু এ পড়া কারুর ভালো লাগত না। লজ্জার খাতিরে কেউ কিছু বলতেই পারতেন না। শেষ পর্যন্ত প্রমথ চৌধুরী এক মতলব আঁটলেন। বললেন—ওর মিল পড়া বন্ধ করছি।

—কি করে ?

—দেখুন না।

তার পরদিন খুব ঘটা করে 'মিল' পড়া সুরু হল। এমন সময় প্রমথ চৌধুরী জিজ্ঞেস করলেন—'মিল' কে ?

লোকেনবাবু—'মিল' কে তুমি জান না ? বলে তিনি মাথায় হাত দিঁয়ে বসলেন। বললেন—তাহলে তোমার কাছে 'মিল' পড়া ব্যর্থ। এই বলে তিনি বই বন্ধ রাখলেন।

আর সকলে হো হো করে হেসে উঠলেন।

*

বঙ্গ ভঙ্গের আন্দোলন চলছে। রবীন্দ্রনাথ মেতে উঠেছেন। নানা জায়গায় সভা-সমিতিতে যোগদান করছেন।

এমনই একদিনে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের মেয়ের বিয়ে। মহারাজা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। রবীন্দ্রনাথকে সকাল সকাল আসতে বলেছিলেন। বিয়ের দিনে সন্ধ্যায় মহারাজা অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন এমন সময় কবি হন্তদন্ত হয়ে এলেন।

মহারাজা তাঁকে দেখে অনুযোগ করলেন—আমার কন্যাদায়, কোথায় আপনি সকাল সকাল আসবেন—তা না এত দেরি করে এলেন।

কবি উত্তর দিলেন—মহারাজ। আমারও মাতৃদায় (বঙ্গভঙ্গ)। দু জায়গায় সভা করে এলুম।

*

নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের স্ত্রী শ্যামামোহিনী দেবী কীর্তন শুনতে ভালোবাসতেন। মহারাজের বন্ধুরা তা জানতেন। তাই একদিন ঠিক করলেন ছদ্মবেশে তাঁরা গান গেয়ে ভিক্ষে করবেন।

মহারাজের বাড়ি। বারান্দার নীচে বাগানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েকজন গান আরম্ভ করলেন। তাঁদের মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, পরণে কালো আলখাল্লা।

মহারাজের ছেলের মাস্টার রজনী মজুমদার রানীমার কাছে খবর দিলেন।

গান শেষ হতে রজনী মজুমদার কিছু টাকা পয়সার রেজগী এনে দিলেন। তাই দেখে একজন কপট-মেজাজ দেখিয়ে বললেন—নাটোরের নাম শুনে এসেছি। আশা আছে মনের মতো বকশিস পাব।

সেই কথা শুনে রানী তাঁদের পঞ্চাশ টাকা দিলেন।

সেই ভদ্রলোকেরা আর কেউ নন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এস্রাজ, মহারাজের হাতে ডুগিতবলা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও যতীন বসু গানের দলে।

তারপর তাঁরা গেলেন দেশবন্ধুর বাড়ি। সেখানেও কিছু রোজগার হল। তারপর ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের স্ত্রী খুব চতুরা। গান শেষে থালা ভরা খাবার এনে নাম ধরে ধরে ডেকে পরিবেশন করলেন ছদ্মবেশীদের।

*

শিলাইদহের কুঠি বাড়ি। বিশ্বকবি, আচার্য জগদীশচন্দ্র ও লেডী অবলা বসু। বিশ্বকবি আচার্য জগদীশচন্দ্রকে বললেন স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য কিছুদিন

পদ্মাবক্ষে নৌকোর ওপর বাস করুন। উভয়েই রাজি হলেন। সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। মোট খাট বাঁধা হল। ঘাটে নৌকো ভিড়ল।

তাঁরা গিয়ে নৌকোয় উঠলেন।

নৌকো চঞ্চলা পদ্মার বুকে ভেসে চলল।

নৌকো ছাড়বার পরেই কুঠিবাড়ির একজন কর্মচারী দেখলেন অতিথিদের ঘরের বিছানায় একটি শিশু ঘুমিয়ে আছে। তিনি বিস্মিত হলেন ভাবলেন তবে কি বাবুমশাইরা ঘুমন্ত শিশুটিকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। যেমনি ভাবা অমনি তিনি নদীর ঘাটের দিকে দৌড় দিলেন। সংগে সংগে আরও কয়েকজন ছুটে এল। নৌকো তখন ঘাট থেকে ছেড়ে গেছে। তারা চিৎকার করে নৌকো ফেরাতে বললেন। তাঁদের চিৎকার শুনে বাবুমশায় নৌকো ফিরাতে আদেশ দিলেন।

ঘাটে নৌকো পেঁছিবামাত্র তাঁরা তিনজনই নৌকোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন—ব্যাপারটা জানবার জন্যে।

লোকেরা তখন তাঁদের চেঁচিয়ে বললে—অতিথিরা শিশু-পুত্রকে কুঠিবাড়ি থেকে নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন। তিনি তাদের বললেন—ছি ছি বড় ভুল হয়ে গেছে। খোকাটিকে আনা হয় নি। তোমরা খোকাকে ঘুমন্ত অবস্থায় নিয়ে এস, দেখ যেন তার ঘুম না ভাঙে।

তারা কুঠিবাড়ির দিকে ছুটল। সংগে সংগে নৌকোও ঘাট ছাড়ল।

কুঠি বাড়িতে লোক-জনেরা দেখলে—বিছানায় অতি যত্নে শুয়ে আছে কোনও খোকা খুকু নয়। একটি সাজানো গোছান ডল পুতুল।

এবার তারা নিজেদের বোকামি বুজলে। নৌকা তখন বহুদূরে ভেসে যাচ্ছে।

বসু-পরিবার নিঃসন্তান। অনেক সময় লেডী বসু একটা বড় ডল পুতুলকে নিয়ে সময় কাটান।

*

শান্তিনিকেতনে একদিন জমজমাট। ঘরে অনেক লোক বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকলেন। বেশ গম্ভীর হয়ে বললেন—নেপালবাবু, আজকাল আপনার অনেক ভুলচুক হচ্ছে, এ ভালো নয়। আপনাকে দণ্ড পেতে হবে। বলে তিনি ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

নেপালবাবু শান্তিনিকেতনের অধ্যাপক। ভাবনায় অস্থির হলেন। তাঁর কাজে এমন কি ভুল হল যার জন্যে গুরুদেব তাঁকে এমন ভাবে বললেন।

উপস্থিত সকলেরই মনে উৎকণ্ঠা।

এমন সময় রবীন্দ্রনাথ একটি লাঠি হাতে করে ঘরে ঢুকলেন। লাঠিটা নেপালবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—এই হল আপনার দণ্ড (লাঠি), কাল আপনি ভুলে ফেলে গেছেন।

তখন নেপালবাবু আর সকলের মুখে হাসি ফুটল!

*

নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী শান্তিনিকেতনে নতুন অধ্যাপক হয়ে এসেছেন। তিনি বেশ একটু স্থূলকায় ছিলেন।

শান্তিনিকেতনে তিনি নতুন লোক বলে কবি তাঁকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করতেন। কবির মুখে 'আপনি' শুনে বয়সে অনেক ছোট গোস্বামী কিন্তু কিন্তু করে বললেন—

আপনি আমাকে 'আপনি' 'আপনি'' বলছেন কেন?

কবি হেসে বললেন—কি করি বাপু, তোমার যে বপুখানি, তার অন্তত মর্যাদা দিতে তো হবে।

*

রবীন্দ্রনাথ ভাইঝি ইন্দিরা দেবী প্রভৃতিকে বহু রঙ্গপূর্ণ কবিতা লিখেছিলেন তাঁর কয়েকটি 'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে ছাপা হয়েছিল। তারই একটিতে ছিল—

"তোদের ফেলে সারাটা দিন
আছি অমনি এক রকম।
খোপে বসে পায়রা যেমন
কচ্ছি কেবল বক্‌বকম॥
আজকে নাকি মেঘ করেছে,
ঠেকছে কেমন ফাঁকা-ফাঁকা।
তাই খানিকটে ফোঁস-ফোঁসিয়ে
বিদায় হলো রবি-কাকা॥"

কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ এই সব কবিতার অংশ নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করতেন। তিনি পাল্টা জবাবে লিখলেন—

"উড়িসনে রে পায়রা-কবি,
খোপের ভিতর থাক্‌ ঢাকা।
তোর বকবকানি আর ফোঁস-ফোসানি
তাও কবিত্বের ভাব-মাখা।
তাও ছাপালি, গ্রন্থ হলো,
নগদ মূল্য এক টাকা॥

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে নৌকোর ওপর বাস করছিলেন, তখন তাঁর কবিবন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে এক পত্রে লিখেছিলেন—

"জলে বাসা বেঁধে ছিলেম,
ডেংগায় বড় কিচিমিচি।
সবাই গলা জাহির করে,
চেঁচায় কেবল মিছিমিছি।
জানো তো ভাই, আমি হচ্ছি
জলচরের জাত।
আপন মনে সাঁতরে বেড়াই,
ভাসি দিন রাত॥"

এ সংবাদে কাব্যবিশারদের আর তর সইল না, তিনি লিখলেন—

"মাছ সেজেছ বেশ করেছ
'জলচরের জাত।'
আর ভেসো না, আর ভেসো না,
হবে কুপো-কাত।
কতই সাধ যাচেছ কবির,
আহা মরে যাই।
পায়রা ছিলে, মাছ হয়েছ,
মাচেছা উড়ো-ঘাই।
কবি, তুমি মানুষ বটে,
হলে পায়রা মাছ।
গেলে স্থলে শূন্যে জলে.
বাকি কেন গাছ?"

*

রবীন্দ্রনাথ এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণে এসেছেন। তাঁর আগমনে গৃহস্বামী খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এত বড় মানী লোক বাড়িতে পা দিয়েছেন, কি করে অভ্যর্থনা করবেন। যথাযোগ্য সমাদর করে একখানি সুন্দর চেয়ার এগিয়ে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ চেয়ারটি দেখে তাঁর বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন—"চেয়ারটি সজীব নয় তো?"

রবীন্দ্রনাথের এই গুরুগম্ভীর প্রশ্নে ভদ্রলোক বিস্মিত হলেন। চেয়ার তো জড়পদার্থ, সজীব হবে কিরূপে। রবীন্দ্রনাথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

কৌতুকী—৭

বন্ধুর এই অবস্থা দেখে তিনি হাসতে হাসতে বললেন—তোমার ভাবনার কিছু নেই, আমি বলছি চেয়ারটি স-জীব অর্থাৎ ওতে ছারপোকা নেই তো ?

বন্ধুটি এতক্ষণে ধাতে এলেন।

*

শান্তিনিকেতনে ক্লাস হচ্ছে। ইংরেজির ক্লাস। গুরুদেব পড়াচ্ছেন। ক্ষিতিমোহন সেন তখন ছাত্র। সন্ধ্যে বেলা। সে বছর খুব দেওয়ালি পোকার উৎপাত বেড়েছে। আলোকে ঘিরে তাদের কি ঘুরপাক। রবীন্দ্রনাথের পড়ানোর ব্যাঘাত হচ্ছে। তিনি একমনে সেই আলোর দিকে পোকাগুলির খেলা দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ হল এমন সময় ক্ষিতিমোহন বলে উঠলেন—গুরুদেব এতক্ষণে আপনি আমাদের ওয়ার্ডসওয়ার্থ পড়াচ্ছিলেন, এবার কি কীট (Keats) পড়াচ্ছেন।

গুরুদেব হাসলেন।

*

ক্ষিতিমোহন সেন নিজের বাড়িতে খেতে বসেছেন। স্ত্রী নানা অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দিয়ে পরিবেশন করছেন। তাই দেখে তিনি বললেন—পাক তো খুব ভাল হয়েছে দেখছি, এবার পরিপাক হলে হয়।

*

এক গানের আসর। বিখ্যাত গায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় গান গাইবেন। রবীন্দ্রনাথ সেই আসরে উপস্থিত। গোপেশ্বর বাবুর গান হয়ে যাবার পর রবীন্দ্রভক্তরা রবীন্দ্রনাথকে ধরে বসলেন একখানা গান গাইতে হবে। রবীন্দ্রনাথ তাই শুনে হেসে বললেন—গোপেশ্বরের পর এবার কি দাড়ীশ্বরের পালা ?

*

রবীন্দ্রনাথরা এক সভা করেন তার নাম দেওয়া হয় 'খামখেয়ালী' সভা। ঠিক হয় প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে মাসে একটা খামখেয়ালীর মজলিস হবে। সেখানে কিছু না কিছু পড়া হবে। খামখেয়ালীর নিমন্ত্রণ পত্র বেশ মজার ছিল। একটা শ্লেটে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেকবার একটা কবিতা লিখে দিতেন। সেটি প্রত্যেক সভ্যের বাড়িতে বাড়িতে ঘুরত। অবনীন্দ্রনাথের 'ঘরোয়া' বই থেকে কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি—

"শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখ শনিবার সন্ধ্যাবেলা
সাড়ে সাত ঘটিকায় খামখেয়ালীর মেলা।
সভ্যগণ জোড়াসাঁকোয় করেন অবরোহণ
বিনয় বাক্যে নিবেদিছে শ্রীরজনীমোহন।"

আর একটা—

"শুন সভ্যগণ যে যেখানে থাকো,
সভা খামখেয়াল স্থান জোড়াসাঁকো।
বার রবিবার রাত সাড়ে সাত
নিমন্ত্রণ কর্তা সমরেন্দ্রনাথ।
তিনটি বিষয় যত্নে পরিহার্য
দাংগা, ভূমিকম্প, পুণা-হত্যাকার্য।
এই অনুরোধ রেখে খামখেয়ালী
সভাস্থলে এসো ঠিক punctually"

আবার—

"এবার
খামখেয়ালীর সভার
অধিবেশন হবার
স্থান কিছু দূরে
সেই আলিপুরে।
নির্মল সেন
সবে ডেকেছেন।
শনিবার রাত
ঠিক সাড়ে সাত।"

এর পরেই—

"এতদ্দ্বারা নোটিফিকেশন
খামখেয়ালীর অধিবেশন
চৌঠা শ্রাবণ শুভ সোমবার
জোড়াসাঁকো গলি ৬ নম্বর।
ঠিক ঘড়ি ধরা রাত সাড়ে সাত
সত্যপ্রসাদ কহে জোড় হাত।
যিনি রাজি আর যিনি গররাজি
অনুগ্রহ করে লিখে দিন আজই।"

*

একবার গুরুদেব আর ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী এক গ্রামে বেড়াতে গেছেন*। গ্রামবাসীরা তো তাঁদের আপ্যায়নের কোনও ত্রুটি রাখেন নি। গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে তাঁদের ভোজনের নিমন্ত্রণ হয়।

ভূরি ভোজ। বহু রকম ব্যঞ্জনাদি তৈরি হয়েছে। আহারে বসেছেন উভয়েই। সামনেই গৃহকর্তা আপ্যায়ন করছেন। শাস্ত্রী মশাই ডিমে হাত দিয়েই বুঝলেন ডিমটি পচা। রবীন্দ্রনাথও বুঝতে পেরেছেন। কিন্তু উপায় কি? গুরুদেব কি করেন তা শাস্ত্রী মশাই দেখছেন।

রবীন্দ্রনাথ ডিমে হাত দিলেন। ভাতের সংগে নিয়ে মুখে দিলেন। অগত্যা শাস্ত্রী মশাইকেও সেই পচা ডিম গিলতে হল। কিন্তু তিনি খাওয়ার পরই বমি করে ফেললেন।

কিছুক্ষণ পরে গুরুদেবকে একলা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি ঐ পচা ডিম কি করে হজম করলেন। আমি তো খেয়েই বমি করলুম।

রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন—খেলে কেন? আমি খাইনি, তাই বমিও করিনি।

আমি দেখলুম ডিমটা আপনি মুখে দিলেন।

—আমি কি সেই ডিম খেয়েছি নাকি? আমি আমার দাড়ির ভেতর দিয়ে সেই ডিম চাপকানের মধ্যে চালান করে দিয়েছি। এখন ফিরতে পারলেই বাঁচি।

*

রবীন্দ্রনাথ পিঠে পুলি খেতে খুব ভালবাসতেন। শান্তিনিকেতনের এক ভদ্র-মহিলা পিঠে তৈরি করে গুরুদেবকে পাঠিয়ে দিলেন। কদিন পরে তিনি এসে কবিকে জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুদেব সেদিন যে পিঠে দিয়েছিলুম তা কেমন খেলেন।

কবি হেসে বললেন—শুনবে, নেহাৎ যখন শুনতে চাও বলি—

'লোহা কঠিন, পাথর কঠিন, আর কঠিন ইষ্টক
তার অধিক কঠিন কন্যে, তোমার হাতের পিষ্টক।'

উপস্থিত সকলে ও পিষ্টককারিনী হেসে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন।

*

বিধুশেখর শাস্ত্রী অগাধ পণ্ডিত। শান্তিনিকেতনের সংগে বহুদিন জড়িত। একদিন রবীন্দ্রনাথের সংগে কাজের কথা হচ্ছে, হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ বললেন—শাস্ত্রী মশাই, আপনি তো বৌদ্ধশাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত, অথচ আপনার হিংসা প্রবৃত্তি গেল না।

বিধুশেখর তো অবাক। কি হিংসার কাজ করেছেন যে গুরুদেব তা লক্ষ্য করেছেন? ভেবেই পান না। মুখের দিকে চেয়ে আছেন—

তখন গুরুদেব ইসারায় গোফ দেখিয়ে বললেন—বাড়তে দিন, এদের বাড়তে দিন—হিংসা করে গুম্ফহীন হবেন না।

বিধুশেখর হাসতে লাগলেন।

*

গুম্ফহীনের কথায় মনে পড়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গুম্ফস্তুতি—রাজনারায়ণ বসুর বৃহৎ গুম্ফকে লক্ষ্য করে লিখিত—

"বিপ্র কহে হাস্য ভরে　　এমনো কি কাজ করে
গোঁপতুল্য আছে কি রতন।
কাঁচা পাকা মনোলোভা　　বাড়ায়ে মুখের শোভা
পাকিলেই বিজ্ঞের লক্ষণ॥
গোঁপের অবহেলায়　　বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়
তা দিয়ে যোগায় আসি তূর্ণ।
মহা মহা গুম্ফী যাঁরা　　দিক্‌পাল সমান তাঁরা
অবনী তাঁদের যশে পূর্ণ॥
এ কি মোর পাগলামি　　গোঁপের মাহাত্ম্য আমি
বচনে কি ফুরাইতে পারি।
পঞ্চমুখে পঞ্চানন　　চেষ্টা পেয়ে ক্ষান্ত হন
বাণী হন বাণীর ভিখারী॥"

আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের—

"শুনিলে সুশ্রাব্য, এ কি কাব্য, কবিকুল অভাব্য
মধুর ছটা।
লভে ইষ্ট সিদ্ধি, গোঁপ বৃদ্ধি, যে চায় যে সমৃদ্ধি
কালো কি কটা॥
পড়ে যেই লোক, এই শ্লোক, পায় সে গুম্ফলোক
ইহার পরে।
যথা গুম্ফধারী, ভারি ভারি, গোঁপের সেবা করি
সুখে বিচরে॥"

*

কবি অক্ষয় চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বাল্যবন্ধু। অক্ষয় তখন ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে খুব আলোচনা করতেন। একদিন রবীন্দ্রনাথ গোঁপ-দাড়ি পরে একজন পার্শী সেজে অক্ষয়চন্দ্রর কাছে এসে তাঁকে বললেন যে তিনি বোম্বাই থেকে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে ইংরেজি সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। অক্ষয়চন্দ্র আলোচনা করতে স্বীকৃত হলেন। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ-স্বরও অক্ষয়চন্দ্র ধরতে পারলেন না। বায়রন, শেলী, কীটস নিয়ে তখন খুব

তর্ক চলছে। অন্যান্যেরা বসে খুব আমোদ উপভোগ করছেন। এমন সময় স্যর তারকনাথ পালিত এসে উপস্থিত। তিনি এসেই 'এ-কে রবি' বলেই তাঁর মাথায় এক চাপড় মারলেন, অমনি রবীন্দ্রনাথের কৃত্রিম দাড়ি গোঁপ খসে পড়ে গেল। অক্ষয়চন্দ্র তো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। অপর বন্ধুরা হাস্য সম্বরণ করতে পারলেন না। সেদিন ছিল পয়লা এপ্রিল।

*

শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসব হবে।

তারই রিহার্সাল চলছে। এমন সময় সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেয়ে মঞ্জরী সেখানে উপস্থিত। তাকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ দিনেন্দ্রনাথকে বললেন—দিনু, আমাদের আর ভাবনা নেই। আমের মঞ্জরীর পার্টটা তা হলে মঞ্জরীকেই দেওয়া হোক, কি বলিস?

দিনেন্দ্রনাথ বললেন—আমের মঞ্জরীর তো কোন পার্ট নেই?

রবীন্দ্রনাথ বলে উঠলেন—আহা, তা নাই থাক, তা বলে নাতনির সঙ্গে একটু পরিহাস করব না।

কিন্তু পরের দিন আর পরিহাস রইল না।

রবীন্দ্রনাথ গান লিখলেন—'মঞ্জরী, মঞ্জরী ও আমের মঞ্জরী'।

*

শান্তিনিকেতনে কয়েকজন সাহিত্যিক বেড়াতে এসেছেন।

কবি তাঁদের দেখে ক্ষিতীশবাবুকে বললেন—দেখ ক্ষিতীশ, এ'রা সাহিত্যিক—ভারি সেণ্টিমেণ্টাল, আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।

তারপর সকলের দিকে চেয়ে বললেন—ঘুম হয়েছিল তো তোমাদের? তোমরা এসেছ এক খারাপ সময়। গরমে কষ্ট হবে, তবে সে দোষ আমার নয়, আকাশের।

দলের একজন বললেন—আর কোন অসুবিধা হয় নি, তবে রাত্রে কোকিলের ডাকে ঘুম হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ বললেন—কোকিলের ডাকে কি কবিদের ঘুম হয় বাপু? আমাদের এখন মাঝে মাঝে ঘুম হয় না বটে, তবে কোকিলের ডাকে নয়, মশার কামড়ে।

*

তখন শান্তিনিকেতন আশ্রমের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। গুরুদেবের সঙ্গে একদিন নানা বিষয়ের আলোচনা চলছে। বিধুশেখর বললেন—গুরুদেব, যদি একটা কাজ করতে পারেন তো অর্থের আর কোনও অনটন থাকবে না।

কেবল আশ্রমের নয়, আপনারও নয়, আমাদেরও নয়, বেশ সুখে দিন কেটে যাবে।

—কি রকম।

—সেটা খুব সোজা। আপনি যদি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে পারেন। একটা কৌপীন এঁটে যদি কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে একবার বসতে পারেন, তবে আর ভাবনা কি? আপনার দাড়ি চুল তো লম্বা আছেই। চেহারাখানাও সুন্দর। লোকে যখন জানবে, রবি ঠাকুর সন্ন্যাসী হয়েছে, তখন টাকা-কড়ি, ফলমূল, নানারকম খাদ্য আসতে থাকবে। দেখতে দেখতে শ্বেতপাথরের একটা মন্দিরও হতে পারবে, তাতে আপনাকে স্থাপন করা হবে। সেখানে ভক্ত ও শিষ্যদের ভীড় ঠেলা অসাধ্য হয়ে উঠবে।

—কিন্তু আমি যে সংস্কৃত বচন ঝাড়তে পারব না।

—সেজন্যে ভাবনা কি? ক্ষিতি ও আমি আপনার চেলা হয়ে সঙ্গেই থাকব। থাকতেই হবে, অন্যথা ভক্তদের দানগুলি সামলাবে কে? ক্ষিতির রূপখানিও তো স্বয়ং একটি সন্ন্যাসীরই মতো। তাকে বেশ মানাবে। তা ছাড়া আপনি মৌনি থাকবেন। যা কিছু বলবার কইবার আমরা দুজনে করব।

—তা ভালই হবে! আমি মৌনি থেকে একটা আঙুল তুলবো, আর আপনারা তা দেখে দুটো আঙুল তুলে সেটা যাহোক একটা ব্যাখ্যা করে দেবেন। ভক্তদের তাক লেগে যাবে। তবে তাই করুন।

*

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে বারান্দায় বসে থাকেন। মাঝে মাঝে এক পাগল তাঁর কাছে এসে গাঁজা খাবার নাম করে দুটো পয়সা নিয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ পাগলদের খুব পছন্দ করতেন আর প্রশ্রয়ও দিতেন।

একদিন হয়েছে কি হঠাৎ দুপুরবেলা সেই পাগলটা এসে একেবারে হাজির রবীন্দ্রনাথের সামনে। এসেই সঙ্গে সঙ্গে আহ্লাদে আটখানা হয়ে রবি ঠাকুরকে বলে উঠলো: না, না, আজ আর আপনার কাছে গাঁজা খাবার পয়সা চাইতে আসিনি, আজ একটা সুখবর দিতে এসেছি।

—'কি ব্যাপার' বলে পাগলের মুখের পানে চেয়ে তার সুখবরটা শোনার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। পাগল এবার এক গাল হেসে বললে: আপনার ছেলেরা আজ আমাকে একটা বেশ বড় গোছের ডিগ্রি দিয়েছে—হ্যা আপনার চেয়েও বড় ডিগ্রি।

—তাই নাকি। তা ডিগ্রিটা কি?

—**M.A.D.**—কেমন, আপনার চেয়ে বড় ডিগ্রি নয়—হ্যা মশাই—

[আপনার ছেলেদের তারিফ করতে হয় এর জন্যে—আমি তো রীতি মতোই গর্বিত।

—তা তো বটেই—বেশ ভালো আর আমার চাইতেও বড় ডিগ্রি আপনি পেয়েছেন—তা আমাকে স্বীকার করতেও হবে। তবে এবার থেকে গাঁজা খাওয়া ছেড়ে দিন—অত বড় ডিগ্রি পেয়েছেন—আর গাঁজা খাওয়া ভালো মানায় না।

তা দিলুম—আজ থেকেই—

বলেই ছুট।

রবিবাবু নিজের মনে বসে বসে হাসতে লাগলেন।

পাগলটা কিন্তু এরপর থেকে গাঁজা খাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েছিল।

*

শান্তিনিকেতনে কয়েকজন মিলে অবসর সময়ে বৈঠকে এক পাঠচক্র করেছিলেন। তাতে থাকতেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, আশ্রমের শিক্ষক সতীশচন্দ্র রায় প্রভৃতি। সেই বৈঠকে কাব্যালোচনা, গল্প পাঠ প্রভৃতি হতো।

গ্রীষ্মের দুপুর। একদিন খেয়ে দেয়ে তাঁরা বসেছেন। দিনুবাবুর হাতে এস্রাজ, দিনুবাবু বললেন—আজ আর পাঠ নয়, সকলে চাঁদা করে কবিতা লেখা যাক্।

তথাস্তু।

সকলের মনে কবিতার ভুত চাপলো। দিনুবাবু প্রথম পয়ারী ছন্দে বললেন—

"এস্রাজ, শোনা আজ সুমধুর তান।
মধুর সংগীতে তোর ভরে যাক্ কান॥"

সবাই চুপ। মনে মনে সকলে এর পরে কি লেখা হবে ভাবছেন। দিনুবাবুর পাশে ছিলেন সতীশচন্দ্র রায়। তিনি ছাড়লেন তাঁর মর্মভেদী বাণ—

"কহিল এস্রাজ শত কান করি খাড়া।
এ গরমে গান কি রে। ওরে লক্ষ্মীছাড়া॥"

এরপর সুরেন মৈত্রের পালা। সুরেন মৈত্র লক্ষ্যভেদ করলেন—

'তবে যদি শালী বলি মলে দাও কান।
গান বাহিরিতে পারে দুই চারি খান॥'

সবাই মিলে কবিতার ইতি করে রীতিমতো পালা করলেন।

*

নগেন্দ্র আইচ শান্তিনিকেতনে বাংলা পড়াতেন। তিনি ক্লাসে বেশ সুর করে কবিতা পড়াতেন—কিন্তু তাঁর মুখে গান কেউ শোনেন নি।

দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মাঝে মাঝে শান্তিনিকেতনে থাকতেন। একদিন তিনি সুধীরঞ্জন প্রভৃতি ছাত্রদের বললেন, নগেনবাবুকে গানে পেয়েছে, শুনেছিস ?

ছাত্রের দল বলল—শুনিনি তো।

দিনুবাবু বললেন—গানে পেয়েছে, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু আমার এই জানালার পাশে রাত দুপুরে গান না গাইলেই নয় ? কি করা যায় বলতো ? ছাত্রেরা বললেন—তাঁকে ডেকে বলে দিলেই হয় একটু তফাতে ও কাজটা সেরে নিতে।

দিনুবাবু বললেন—তা কি লোককে বলা চলে। দেখি কি করতে পারি।

সেই দিনই বেশ একটু রাত্তিরে শোনা গেল নগেনবাবু গুনগুন করে গাইছেন। যেই না নগেনবাবু সুর ভেঁজেছেন অমনি দিনুবাবু এস্রাজ নিয়ে জুড়ে দিলেন—

“গভীর রাতে তোমার অত্যাচার।
নগেন আইচ শত্রু হে আমার॥
তোমার গান কান্না সম—
আসে না ঘুম নয়নে মম—
দুয়ার খুলি হে মোর যম
তোমায় তাড়াই বারে বার।”

নগেনবাবুর গুন-গুনানি সেই থেকে থেমে গেল—আশ্রমে আর কেউ কোন দিন তাঁর গান শোনেন নি।

*

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কবি রাজকৃষ্ণ রায়ের সম্বন্ধে একটা মজার কথা বলেছিলেন।

বহুদিন আগে একবার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, তাঁর ভগ্নিপতি যদুনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁদের এক আত্মীয় কেদারবাবু—পশ্চিম অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেই সময় কোন এক স্টেশনে একটি ময়লা কাপড় পরে, খালি পায়ে একটি কিশোর এসে তাঁদের কাছে বললে—আমি মামার বাড়ি যাব, হাতে পয়সা নেই, দয়া করে যদি আমার ভাড়াটি আপনারা দেন তো বড় উপকার হয়। যদুবাবু বড় আমুদে লোক ছিলেন। তিনি তামাসা করে বললেন—তুমি কবিতা-টবিতা লিখতে পার ? বালকটি সপ্রতিভভাবে মৃদুস্বরে বললে—হ্যাঁ, পারি।

যদুবাবু আরও কৌতূহলী হয়ে বললেন—বাঃ বাঃ, বেশ বেশ, দেখ এই কেদার আমায় আমার প্রেয়সী 'তারা'র কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বল তো বাপু, এমন করে কি ভদ্রলোককে দুঃখ দিতে হয়? তুমি এই বিষয়ে একটা কবিতা লিখে দাও তো।

বালকটি তখুনি এক চোতা কাগজে পেন্সিল দিয়ে ফস্‌ফস্‌ করে একটা প্রকাণ্ড কবিতা লিখে দিলে। তার প্রথম দুছত্র হল—

"কেদার দেদার দুখ দিলেন আমায়
তারা ধনে হারা করে আনিয়ে হেথায়।"

বলা বাহুল্য কিশোরটি পরবর্তী জীবনে কবি রাজকৃষ্ণ রায়।

*

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর শিকারের ঝোঁক ছিল। প্রতি রবিবারেই তৎকালীন ধাপার মাঠে শিকার করতে যেতেন। দলে প্রায়ই থাকতেন মেট্রোপলিট্যান কলেজের সুপারিনটেনডেন্ট ব্রজনাথ দে, রবীন্দ্রনাথ এবং আরও অনেকে।

এমনি একদিন শিকার থেকে ফেরবার পথে কার এক বাগানে দেখতে পেলেন বেশ সুন্দর সুন্দর ডাব রয়েছে। অমনি তাঁদের সকলেরই তেষ্টা পেয়ে গেল। কিন্তু অজ্ঞাত লোকের বাগান, উপায় কি? ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে বললেন—এস আমার সঙ্গে, এই বলে বাগানে ঢুকেই গম্ভীরভাবে মালিকে বললেন—ওরে মালি, মামা কই?

মালি ভাবল, এঁরা বুঝি বাগানের মালিকের ভাগনে। সে সম্ভ্রমে উত্তর দিলে—তিনি তো আসেন নি? ব্রজবাবু একটু চিন্তার ভাব করে বললেন, তাই তো, মামা একেবারেই আসে নি।

মালি জোড় হাতে নিবেদন করল—আজ্ঞে না। ব্রজবাবু—বটে, তবে আর কি হবে, আচ্ছা কটা ডাব পাড় দেখি।

মালি শশব্যস্তে তখনি আজ্ঞাপালন করল। আর সকলে মিলে খুব তাড়াতাড়ি তার সদ্ব্যবহার করে সে স্থান থেকে চম্পট দিলেন।

*

মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে ঠকাবেন গগনেন্দ্রনাথ। বিডন স্ট্রীটের নিমাই বসুর সঙ্গে বাজি। মহারাজা দান খয়রাত খুব করতেন। একদিন এলেন এক গরীব ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত, বললেন—আমায় সাহায্য করুন, কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করুন।

যতীন্দ্রমোহন খাজাঞ্চিকে হুকুম দিলেন—একশ টাকা দাও।

টাকার থলিটা হাতে নিয়ে ব্রাহ্মণ পরচুল খুলে ফেললেন।

যতীন্দ্রমোহন—এ কি গগন, তুমি ?

গগনেন্দ্রনাথ—হ্যাঁ, আমি বাজি রেখেছিলুম নিমাই-এর সঙ্গে তোমায় ঠকিয়ে টাকা নেবো। সেইজন্যই পরচুলা।

টাকা সেদিন দান করা হল এক সত্যকার কন্যাদায়গ্রস্তকে।

*

ক্ষিতিমোহন সেন তখন সবে মাত্র শান্তিনিকেতনে যোগ দিয়েছেন। বেশ স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। তখন জুতো পায়ে ক্লাস করা চলত না। ক্ষিতিমোহন ক্লাসে এসে দেখলেন—একটি ছাত্র জুতো পরে রয়েছে।

তিনি তাকে জুতো বাইরে খুলে রাখতে বললেন।

ছেলেটি নতুন শিক্ষককে বললো—এখানে ক্লাসে জুতো রাখাই নিয়ম।

ক্ষিতিমোহন উত্তর শুনে রেগে বললেন—অবাধ্যতা করলে মার খাবে।

ছেলেটি চটপট বললে—আশ্রমে মারবার নিয়ম নেই।

তখন ক্ষিতিমোহন কোন কথা না বলে ছেলেটিকে এক হাতে শূন্যে তুলে বললেন—এখন তুমি আশ্রমের বাইরে—

তারপর গালে এক চড় মারলেন।

*

দ্বিজেন্দ্রনাথ একদিন শুনলেন তাঁর প্রিয় ভৃত্য কাকে যেন লুচি ভাজা ঘিয়ের কথা বলছে।

তিনি তখনই চাকরকে ডেকে বকাঝকা করে বললেন—আজকাল নবাবি খুব বেড়ে গেছে, ঘি দিয়ে লুচি ভাজা বড় অন্যায়, আমরা ছেলেবেলায় দেখেছি জল দিয়ে লুচি ভাজা হতো।

মনিবের স্বভাব চাকরটির অজানা ছিল না। তাই বললে—না বাবু জল দিয়ে হয় না, ঘি গলে গেলে জলের মতো দেখায়।

মনিব তখন হাসতে হাসতে বললেন—তাই বল, ঘি গলে গেলে জলের মতো হয়, যাক তোর কাছে একটা নতুন শিক্ষা হল।

*

শান্তিনিকেতনের মাঠে কালবৈশাখীর ঝড়ের প্রচণ্ডতা অত্যন্ত বেশি। প্রায়ই কালবৈশাখীর ঝড়ে টিনের চাল, চালাবাড়ি উড়িয়ে ফেলে ক্ষতি করত।

এই রকম এক কালবৈশাখীর ঝড়ের পরের দিনেই দিনেন্দ্রনাথের বাড়িতে দ্বিজেন্দ্রনাথ, দিনেন্দ্রনাথ, জগদানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন বসেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—জগদানন্দ, কালবৈশাখীর ক্ষতি থেকে বাঁচবার একটা বুদ্ধি এসেছে. আর কোনও ভয় নেই।

জগদানন্দবাবু বললেন—বলুন, কি করতে হবে ?

দ্বিজেন্দ্রনাথ বললেন—পশ্চিম কোণ থেকে ঝড় আসে, এক কাজ করো, ওদিকে প্রকাণ্ড একটা উঁচু পাঁচিল তুলে দাও। না, না, অসম্ভব মনে করো না, চীনের পাঁচিলের কথা শুনেছ তো, পনের শ মাইল লম্বা, আর, এইটুকু তোমরা পারবে না ? এতে আর এক সুবিধে আছে, পাঁচিলে যেমন ঝড় আটকাবে তেমনি পাঁচিলের জন্যে যে মাটি তোলা হবে, তাতে একটা বড় পুকুর হয়ে যাবে, তাতে তোমাদেরও জলকষ্ট দূর হবে, এক ঢিলে দু পাখি মারা হবে, লেগে যাও, আর দেরি নয়, কাজ আরম্ভ করে দাও।

জগদানন্দবাবু বললেন—এতো খুব ভাল প্রস্তাব, তবে কিনা গুরুদেব এখানে নেই, তাঁকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার।

দ্বিজেন্দ্রনাথ অমনি বলে উঠলেন—না, না, রবিকে জিজ্ঞাসা করার দরকার কি ? কালই কাজ আরম্ভ করে দাও কি বল ?—এই বলে তিনি হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

*

গরমের ছুটিতে শান্তিনিকেতন ফাঁকা। অনেক ছাত্রই বাড়ি চলে গেছে। ছেলেদের জন্য বরাদ্দ যে দুধ ছিল—তা প্রত্যেক দিন বাড়তি পড়ে থাকছে। পরিচালক এসে রবীন্দ্রনাথকে বললেন বাড়তি দুধের কথা।

রবীন্দ্রনাথ শুনে একটু ভেবে বললেন—শাস্ত্রী মশাইতো শান্তিনিকেতনে আছেন—তিনি নিরামিষভোজী—তাঁকেই বেশি করে দুধ দিন। এই বলে তিনি একটা চিরকুটে দুলাইন লিখে ভৃত্যকে ডেকে বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

শাস্ত্রীমশাই চিঠি পড়ে দেখলেন—তাতে লেখা—"শাস্ত্রীমশাই এখন থেকে আপনার কাছে দৈনিক তিন-চার সের দুধ যাবে। আপনাকে দুগ্ধপোষ্য রাখব মনস্থ করেছি"।

॥ বার ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাশীতে গেছেন—খেয়াল হল, কাশীর গঙ্গার ওপারে রামনগরে যাবেন। সকাল বেলায় নৌকো ভাড়া করে গঙ্গার ওপর দিয়ে রামনগরের কাছে এসে পৌঁচেছেন, এমন সময় রামনগরের তীরে একটি মড়

পড়ে আছে, আর তারই কিছু দূরে একটা গাধা চরে বেড়াচ্ছে। তাই দেখে শরৎবাবু সঙ্গীদের বললেন—কাশীর মাহাত্ম্যর চেয়ে রামনগরের মাহাত্ম্য বেশি, কারণ এখানে মরলে সদ্য সদ্য ফল পাওয়া যায় দেখছি।

সকলে উৎসুক হয়ে বললে—কি রকম?

শরৎবাবু—কেন জানেন না, কাশীতে মরলে স্বর্গবাস আর ব্যাস-কাশীতে (রামনগরে) মরলে গাধা হয়। তা ঐ দেখুন, লোকটা সদ্য সদ্য মরেছে আর মরেই সদ্য সদ্য গাধা হয়ে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে।

তাই দেখে সকলে হাসতে লাগলেন।

*

শরৎবাবু তাঁর বাড়িতে বসে আছেন। পাশে তাঁর প্রিয় আদরের কুকুর ভেলু। এমন সময় একজন বৈষ্ণব গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, হাতে ঝোলা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে বসলেন। অহিংসা, বৈষ্ণবধর্ম, জীবে প্রেম নিয়ে আলাপ চলছে। আলোচনার সময় তার ঝোলার মধ্যে থেকে জপের মালাটি বেরিয়ে পড়েছে। ভেলু তাঁদের আলাপের মধ্যেই কখন সেই জপের মালাটি মুখে তুলে নিয়েছে তা কারুর নজরে নেই। হঠাৎ বৈষ্ণবের নজর পড়ল, দেখেই তো চক্ষুস্থির। কঠোর দৃষ্টিতে তার জপের মালা কুকুরের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেন।

শরৎবাবু বৈষ্ণবটির বিরক্তিব্যঞ্জক মুখ দেখে হাসতে হাসতে বললেন—আপনার জীবে প্রেম বুঝি এখনও কুকুর পর্যন্ত পৌঁছয় নি।

বৈষ্ণব ভদ্রলোকটি তো থ।

*

ভেলুকে নিয়েই কথা। শরৎবাবুর সামনে ভেলু কুকুরকে কেউ তাচ্ছিল্য করলে শরৎবাবু তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন। সুতরাং তাঁর কাছে যাঁরা যেতেন, তাঁরা সে কথা জানতেন তাঁরা ভেলুকে স্নেহ দেখাতেন। সেই ভেলুর মৃত্যু হল।

'বাতায়ন' সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল ভেলু সম্বন্ধে এক কাহিনী ফলাও করে লিখলেন।

'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস লিখলেন—ভেলুর বিনাশ নেই, ভেলু অবিনাশ।

*

কোনও এক পরিচিতের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দাবা খেলা হচ্ছে দেখে শরৎবাবু এক হাত খেলতে বসে গেলেন।

খেলতে বসেই শরৎবাবুর একটা নৌকা খোয়া গেল। তাতে শরৎচন্দ্র বলে উঠলেন—যাক্, যাক ওটা আমার ফুটো নৌকো।

একটু পরেই ভদ্রলোক আবার একটা ঘোড়া মেরে দিলেন—এবারে বললেন—যাক্ বাঁচা গেল, আস্তাবল ফাঁকা হল, ওটা আমার বেতো ঘোড়া ছিল।

খেলা চলতে চলতে বেলা হয়ে গেল। পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে খাওয়ার কথা বললেন। খাওয়ার কথা শুনেই তিনি বললেন—তুমি তো জান আমার খেলেই আনন্দ।

পরিচিত—না, দাদা, আমি ঠিক জানিনে। আপনি 'খেলে' বলতে কি বোঝাচ্ছেন। খেলা না খেয়ে। শরৎচন্দ্র—দুয়েই।

ঠিক আছে, খেলতে খেলতে খাওয়া যাবে।

*

মুঙ্গেরে গেছেন শরৎচন্দ্র নিজের ভাই-এর বিয়ে উপলক্ষে। পুরোহিত নিয়ে যেতে ভুলে গেছেন। সেখানে তাঁর এক সাহিত্যিক বন্ধু তাঁর গৃহ-পুরোহিতকে বিবাহ-অনুষ্ঠানের ভার দিলেন।

সুশৃঙ্খলায় কাজ চুকে গেল। শরৎবাবু পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার দক্ষিণা কত?

পুরোহিত তাঁকে তাঁর যজমানের বিশেষ পরিচিত বলে দক্ষিণার কথা উল্লেখ না করে বললেন—আপনার যা অভিরুচি।

শরৎচন্দ্র হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কোন্ ক্লাসের?

পুরোহিত তো অবাক। বললেন—কোন্ ক্লাসের মানে?

শরৎবাবু—পুরোহিতদের তো অনেক ক্লাস, যেমন মাস্টার ক্লাস, বাজার সরকার ক্লাস, ঘটক ক্লাস,···

পুরোহিত—না, আমি শুধু পুরোহিত ক্লাস।

শরৎচন্দ্র তাঁকে আশাতীত দক্ষিণা দেন।

*

শরৎচন্দ্রের এক পরিচিত ব্যক্তি একদিন বললেন—শরৎবাবু, রবীন্দ্রনাথের লেখা বড় দুর্বোধ, আপনার লেখা তবু আমরা বুঝতে পারি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লেখায় দাঁত ফোটাতে পারি না।

শরৎবাবু বললেন—ঠিক কথা, আমি যা লিখি আপনাদের জন্য আর রবীন্দ্রনাথ যা লেখেন—আমাদের জন্য। এই জন্যই তফাৎ।

ভাগলপুরে তখন শরৎচন্দ্র।

এক পিওন একটা চিঠি নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরে ফিরে তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলে- এখানে মচ্ছরচন্দ্র বাবু বলে কেউ থাকেন ?

শরৎচন্দ্র বললেন—দেখি চিঠিখানা। চিঠিখানা ওপরের খামটা দেখেই বললেন—এ চিঠি আমার। নাম লেখা 'শ্রীমচ্ছরচচন্দ্র শর্মা"।

পাশেই তাঁর বন্ধু বসেছিলেন, চিঠি দেখে বললেন—সে কি তোমার নাম 'মচ্ছরচ্চন্দ্র' হল কি করে ?

—বুঝছ না এটা অমুকের রসিকতা। আমার নামটা সন্ধি করে দিয়েছে—শ্রীমৎ শরৎচন্দ্র শর্মা। দাঁড়াও তার রসিকতার প্রত্যুত্তর দিচ্ছি।

এই বলে বন্ধুকে বললেন—এক কাজ কর, ঐ রাস্তা থেকে একটা পাথর নিয়ে এস।

বন্ধু পাথর নিয়ে এলেন।

তখন শরৎচন্দ্র বললেন—একে বেশ ভাল করে প্যাক কর, আমি একটা চিঠি দিচ্ছি এর সংগে। এই বলে দু লাইন লিখে তিনি একটা চিঠি তার ভেতরে পুরে দিলেন।

পাথর ও চিঠি প্যাক হল। ডাকঘরে ওজন হল, মাশুল দেখা হল। সেই মাশুলটা ভি পি করে বন্ধুর কাছে পাঠান হল।

বন্ধুটি পয়সা খরচ করে ভি পি নিলেন প্যাকিং খুলে পাথর পেলেন, তার সংগে চিঠি তাতে লেখা—

"তোমার কুশল জেনে আমার মনের পাথরভার নামিয়ে দিলুম।

*

শরৎবাবুর সময়ে এক দ্বিতীয় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব হয়। ইনিও লেখক। 'শান্তিজল' 'চাঁদমুখ' প্রভৃতি কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করেন। 'গল্পলহরী' মাসিক পত্রের সম্পাদকও ছিলেন। এরই দৌলতে শরৎচন্দ্র "শ্রীহীন হয়েছিলেন।

সেই সময়ে শরৎচন্দ্রের সংগে এক বাল্যবন্ধুর দেখা। বহু বছর পরে। বাল্যবন্ধু প্রথমে মুখের দিকে হাঁ করে চেয়েছিলেন।

শরৎচন্দ্র তাই দেখে বললেন—কি হে চিনতে পারছ না, আমি শরৎ।

বন্ধুটি তখন চিনতে পেরেও রসিকতা করে বললেন—আজকাল সাহিত্যের বাজারে দুজন শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব তুমি কোন জন ?

শরৎচন্দ্রও রসিকতা করে বললেন—'চরিত্রহীন'।

*

শরৎবাবুর ছেলেবেলার একদিনের ঘটনা। উপেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্মৃতি-কথা'য় বেরিয়ে ছিল।

শরৎচন্দ্র, উপেন গঙ্গোপাধ্যায় ও সুরেন গঙ্গোপাধ্যায় এঁরা তিন মামা ভাগ্নে কিশোর বয়সে এক রসবহুল চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটিয়েছিলেন।

তাঁরা একদিন ভবানীপুর জগুবাবুর বাজারের ধারে এক ভাবে রাস্তার এক গর্তের দিকে চেয়েছিলেন।

একটা লোক তাদের ঐভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞেস করলে—এখানে কি হয়েছে? কি আছে গর্তে?

কথার কোনও জবাব না দিয়ে তাঁরা একই ভাবে বলে চললেন—এই এবার যেন লাল আভা দিচ্ছে না?

কি হয়েছে মশাই, কি ব্যাপার, আরও কয়েকজন জড় হল।

শরৎচন্দ্র বললেন এবার নীলচে আভা না, সঙ্গে সুরেন বললেন—এবার আসমানি রঙ, দ্যাখ দ্যাখ আবার কমলালেবুর রঙ ছড়াচ্ছে।

আস্তে আস্তে ভীড় জমে উঠল, ভীড় ঠেলে তারা জিজ্ঞেস করলে—কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি দেখছেন?

উপেন্দ্র বললেন—এই আস্তে, আস্তে, পালাবে। তখন আর একজন বললে কি পালাবে মশাই?

—চুপ, চুপ, সাপ···

বলার সঙ্গে সঙ্গে সভয়ে সে যেন পেছিয়ে এল। উপেন্দ্র একটু উঁকি-ঝুঁকি মেরে বলে উঠলেন—এই আলোগুলো ওর মাথার মণির, দেখছিস না আভা ছড়াচ্ছে। কখন লাল কখনও নীল···

সঙ্গে সঙ্গে একজন বলে উঠল—ঐ যে ঐ যে, আবার আলো ছড়াচ্ছে··· এবার পান্নার মতো সবুজ।

আর যায় কোথা। ভীড়ও সর্পিল গতিতে এগিয়ে এল। সেই ফাঁকে ছেলে তিনটি পলাতক। বিকেলে তারা বেড়াতে বেড়াতে চক্রবেড়ের ধারে দেখে এক বিরাট জনতা। পথে চলার উপায় নেই, গাড়ী চলাচল বন্ধ, হৈ হৈ ব্যাপার।

এবার তাঁরা জনতার সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মশাই, এখানে এত ভীড় কেন?

ভীড় থেকে বেরিয়ে আসা একজন জবাব দিলে—আশ্চর্য কাণ্ড, গর্তের ভেতরে সাপ আর তার মাথায় মণি জ্বলছে. লাল আভা অবশ্য আমি দেখিনে, সবুজ আভা দেখেছি।

তিনটি কিশোর এবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল। সকালে যে চারাগাছ তারা রোপণ করেছিলেন—বিকেলে তা মহীরুহ হতে দেখে নিজেরাই হতবাক্ হয়ে গেল।

*

একবার শরৎবাবু ও উপেনবাবু ট্রামে করে যাচ্ছেন। কন্ডাক্টর এল। উপেনবাবু মনিব্যাগ থেকে একটা টাকা বার করে দিলেন। কন্ডাক্টর টাকা নিয়ে ব্যাগের মধ্যে ফেলে দিয়ে টিকিট কাটতে যাবে এমন সময় শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রের কানের কাছে ফিস-ফিস করে অথচ কন্ডাক্টর যাতে শুনতে পায় এমনভাবে বললেন—কি সেই টাকাটা ?

আর যায় কোথা। কন্ডাক্টর ভাবলে এরা নিশ্চয়ই অচল টাকা চালিয়েছে। কিন্তু সে ব্যাগের ভেতর ফেলে দিয়েছে। ব্যাগে আরও টাকা ছিল। ব্যাগ খুলে টাকাগুলো বেশ কিছুক্ষণ নাড়া-চাড়া করে দেখলে। তবু সন্দেহ গেল না—বললে, অচল চালালেন তো। আমারই লোকসান যাবে দেখছি। বলে চলে গেল।

দুজনে হাসাহাসি করতে লাগলেন।

*

দেউলটির বাড়িতে শরৎচন্দ্র।

কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক তাঁর সংগে দেখা করতে গেছেন। প্রসংগক্রমে জিজ্ঞেস করলেন—এখানে ম্যালেরিয়া আছে কি না, এখানকার স্বাস্থ্য কেমন ইত্যাদি ?

শরৎচন্দ্রের পাশে তাঁর বৃদ্ধ ভগিনীপতি বসে ছিলেন। শরৎচন্দ্র তাঁকে দেখিয়ে বললেন—অতশত জানি না। তবে উনি বলেন এতখানি বয়স হল বাইরে বসে নিশ্চিতভাবে তামাক খাবার উপায় নেই (অর্থাৎ-গুরুজনদের কারুর না কারুর নজরে পড়বে)।

*

শরৎচন্দ্রের এক বাল্যবন্ধু এক গল্প লিখেছেন। পড়ে শোনাচ্ছেন, শরৎচন্দ্র শুনছেন। গল্পের শেষের দিকে একটা বাড়ির রঙ বদলানর কথা ছিল। গল্প পড়া শেষ হলে শরৎচন্দ্র বললেন—গল্পটা ঠিক হয়েছে। তবে আমি হলে গল্পের শেষটা বদলে দিতুম।

বন্ধু বললে—কি বদলাতিস।

শরৎচন্দ্র—আমি হলে রঙ না বদলে সমস্ত বাড়িটাই ধুলিস্যাৎ করে দিতুম। শুধু তাই নয়, কুলি-মজুর লাগিয়ে জমির ভিৎ খুঁড়ে, জমির মাটি

কেটে, এক প্রকাণ্ড পুকুর তৈরি করে তার মাঝে শ্বেতপাথরের ঘাট বাঁধিয়ে দিতুম।

বন্ধু অবাক হয়ে বললেন—অতবড় বাড়িটা ভেঙে চুরে পুকুর তৈরি করবি। সে কি কখন হয়?

শরৎচন্দ্র—কেন হবে না। ওই বাড়িও তোর নয়, আমারও নয়। জমিও তোর নয়, আমারও নয়। হাতে যখন কলম আছে, তখন সেই কলমের এক খোঁচায় বাড়ি ভাঙতে কতক্ষণ। পুকুর কেটে ঘাট করতে কতক্ষণ। কি বলিস।

বন্ধুটি হাসতে লাগলেন।

॥ তের ॥

দাদাঠাকুরের পরিচয় হয়তো সকলে জানেন না। মহাম° হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশাই তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন—'তার নাম সোজাসুজি শরৎ পণ্ডিত—বিদূষকের এডিটর, তিনি মুখে মুখে পদ্য লেখেন, তাঁর কাগজও পদ্য। তিনি একাধারে এডিটর, প্রুফরীডার, কম্পোজিটার, ডেসপ্যাচার—তিনি কেবল সাবসক্রাইবার নন। সেকালে ভাঁড়ের কথা শুনেছিলুম তিনি সেই ভাঁড়। তিনি খুব তেজস্বী ব্রাহ্মণ, বেশ মিষ্টি করে সকলকে হক কথা শুনিয়ে দেন।'

কোনও এক সাহিত্য-আসরে দাঠাকুর এলেন। দাঠাকুর তখন বিদূষক কাগজের সম্পাদক। সেই আসরে শরৎ চট্টোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। শবৎচন্দ্র দাঠাকুরকে আসতে দেখেই সাদরে আহ্বান করলেন—এস, এস হে বিদূষক শরৎচন্দ্র।

দাঠাকুরও কম যান না। প্রত্যুত্তর দিলেন কেমন আছ ভাই 'চরিত্রহীন' শরৎচন্দ্র।

*

এক্সপার্ট এডভার্টাইজিং-এর কানাইবাবুর ঘরে আমরা বসে আছি। এমন সময় দাঠাকুর এসে হাজির। দাঠাকুর আর কানাইদার সঙ্গে কবিতার লড়াই লেগে গেল। ক্রমে তা আদিরসাত্মক হয়ে উঠল।

আমার ভাই শৈলেন বললে—দাঠাকুর আপনার মুখখানা যেন পায়খানা। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না।

দাঠাকুর হাত নেড়ে জবাব দিলেন—ঠিক বলেছিস, আমার মুখ পায়—খানা অর্থাৎ খানা (খাবার) পায়।

*

দাঠাকুর পথে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন—রামু কোথায় রে?

রামু অর্থাৎ রমেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ আমার ছোড়দাদু।

বললুম—আশ্রমে আছেন।

বললেন—বেশ আছে। জেনে রাখ—যারা শ্রম করে খায় তারা শ্রমিক আর যারা বিনাশ্রমে খায় তারা আশ্রমিক। বুঝলি, রামুকে কথাটা জানিয়ে দিস।

*

দাঠাকুরকে তাঁর পরিচিত একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আপনি রবি ঠাকুরকে দেখেছেন?

তিনি সংগে সংগে উত্তর দিলেন—না দেখিনি, তবে দেখা হলে বলতুম, আপনি যেমন 'ঠাকুর,' আমিও তেমনি 'পণ্ডিত'।

*

নলিনীকান্ত সরকার শরৎ পণ্ডিতের খুবই স্নেহভাজন। বহুদিন আগে দুজনে কোন এক স্থানে একসংগে ছিলেন। একদিন হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘুম ভেংগে তিনি নলিনীকান্তকে জাগিয়ে বললেন—ওরে নলিনী, একটা বড় জিনিস আবিষ্কার করেছি। নলিনী পণ্ডিতের সব সম্পত্তি আমার আর তোর।

সদ্য ঘুম ভাঙা অবস্থায় নলিনীকান্ত বললেন—কি করে হবে?

—কেন, তুই নলিনী আমি পণ্ডিত, দুজনে মিলে নলিনী পণ্ডিত। (নলিনী পণ্ডিত ছিলেন সাহিত্যিক ও সাহিত্য-পরিষদের চির সুহৃদ)

*

দাঠাকুরের ট্যাঁকে বা চাদরের খোঁটে পয়সা থাকে। এক ভদ্রলোক তাঁকে বললেন—আপনি টাকা-পয়সা আয়রন চেস্টে রাখেন না কেন?

তিনি উত্তর দিলেন—যাদের চেস্ট আয়রনের মতো তারাই আয়রন চেস্টে টাকা রাখে।

*

এক শীতের দিনে কোনও এক সভায় আমন্ত্রিত হয়ে দাঠাকুর গেছেন। সেখানে সব অতিথিরা বড় বড় লোক, শাল-দোশালা পরে এসেছে। দাঠাকুর খালি গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে যেমন সব জায়গায় যান তেমনি ভাবে এসেছেন। এক পরিচিত ব্যক্তি তাঁকে বললেন—শরৎবাবু, এই শীতের সন্ধ্যায় আপনি একটা গরম কাপড় গায়ে দিয়ে আসতে পারতেন—আপনার শীত করছে না?

দাঠাকুর বললেন—শীত কেন করবে, পয়সায় গরম হয়ে আছে—এই বলে তিনি ট্যাঁক থেকে পয়সাগুলি বার করে দেখালেন।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে রইলেন।

*

দাঠাকুর তখন স্কুলের ছাত্র।

গ্রামের বিদ্যালয়ে স্কুল ইনসপেক্টরের আসা উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ব্রাহ্মণ-শিক্ষকরা নিজে হাতে খাদ্য পরিবেশন করছিলেন। প্রধান শিক্ষক তদারক করছিলেন। সেই সব কাণ্ডকারখানা দেখে শরৎচন্দ্র তার এক বন্ধুর দিকে ফিসফিস করে বললেন—স্কুলের পিতৃশ্রাদ্ধ হচ্ছে। অদূরে দাঁড়ানো স্কুলের তৃতীয় মাস্টারের কানে গেল। শরৎকে ডেকে বললেন—কি বলছিলিরে শরৎ। শরৎ কথাটা পুনরাবৃত্তি করলেন। শুনে ক্রুদ্ধ মাস্টার বললেন—জানিসনা এটা 'এডেড' স্কুল? উত্তরে শরৎ বললেন—জানি স্যর, এটা 'এ ডেড' স্কুল। সাজার ব্যবস্থা হল বেঞ্চির ওপর দাঁড়াবার। তিনি মাস্টারকে জানালেন ইন্‌স্‌পেক্টর যদি জানতে চায় তিনি সত্য কথাই বলবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বসতে বলা হল। পরের দিন হেডমাস্টার মশাই-এর কাছে অভিযোগ গেল। হেডমাস্টার তাঁকে ডেকে—অভিযোগকারী মাস্টারকে বললেন—দেখেছ ওর বয়স কত। এই বয়সে ও যা অভিমত প্রকাশ করেছে তা আমরা পারব না। সাজা দিয়ে ওর নিজস্ব মতামত প্রকাশকে রোধ করা হবে।

শরৎকে বললেন—বাবা। তুই ঠিক কথা বলেছিস। তোকে সাজা পেতে হবে। সেটা হল তোকে আমি পেট ভরে মিষ্টি খাওয়াব। হেডমাস্টাব প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন।

*

সিউড়ীতে লাটসাহেব রোনাল্ডসে এসেছেন। সম্বর্ধনা। গুরুসদয় দত্ত দাদাঠাকুরকেও নিমন্ত্রণ করেছেন। লাটসাহেবের পারসোনাল সেক্রেটারী গুরলে গেটে নিমন্ত্রণেব কার্ড পরীক্ষা করে অতিথিদের ঢুকতে দিচ্ছেন। দাদাঠাকুর গেটে হাজির। গায়ে জামা নেই। পায়ে জুতা নেই। এ লোক কখনও নিমন্ত্রিত হতে পারে না। কার্ড দেখেও তাঁকে ঢুকতে দিতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত লাটসাহেবের কানে কথা যায়—তাঁরই আদেশে দাদাঠাকুর সভায় ঢোকেন। দাদাঠাকুর সভায় অনেক সরস কথা বলে সকলকে মুগ্ধ করেন। তারপর ঐ গুরলে হন্তদন্ত হয়ে দাঠাকুরকে বললেন—লাটসাহেব আপনার প্রতি সন্তুষ্ট। আপনাকে সার্টিফেকেট দিতে চান। দাদাঠাকুর কৌতুক করে

বললেন—আমি যদি চুরি করি তবে ঐ সার্টিফিকেট দেখিয়ে আমি কি খালাস পাব।

গুরুলে বললেন—না, তাও কি হয়? দাদাঠাকুর বললেন—তবে দরকার নেই।

সার্টিফিকেট প্রত্যাখ্যান করলেন।

*

আর্ট থিয়েটারে প্রতি অভিনয়-সন্ধ্যায় ম্যানেজার অপরেশ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে একটা জমাট আড্ডা বসত। অনেকেই আসতেন। হাতিবাগানের মোড়ে দাঠাকুর কাগজ বিক্রি করছেন। দাঠাকুরকে সেখানে একজন নিয়ে এলেন। দাঠাকুরকে পেয়ে সকলেই খুশি। অপরেশবাবু জীবনবাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী, প্রবোধ গুহ প্রভৃতি। দানিবাবু হাত তুলে নমস্কার করে বললেন—আজকাল চোখে ভালো দেখতে পাই না, আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। দাঠাকুর গিয়ে তাঁর পাশে বসলেন তাঁর সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলেন। তাই দেখে অভিনেতা তিনকড়িবাবু কৃত্রিম ক্ষোভে বললেন—পন্ডিত মশাই, আমাদের দিকেও একটু কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল—গরীব ব্রাহ্মণ দানী দেখলেই তাঁর কাছে যাই। আপনার ও তিনটে কড়ি একমাত্র বামুনের হুঁকোয় লাগানো ছাড়া আর কোন কাজে লাগতো না। তাই ওদিকে আর ঘেঁসেনি। হাসির রোল উঠল।

*

সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের বাড়ি গোয়াবাগানে। দোতলায় তাঁর লাইব্রেরি ঘর। সেই ঘরে বসে কাজ করেন ও লোকজন এলে সেই ঘরেই কথাবার্তা হয়। উঠোন থেকে সিঁড়ি উঠে দোতলায় গেছে।

নীচে কুকুর আছে। কেউ এলেই ডাকাডাকি করে। দাঠাকুর (শরৎ-পন্ডিত) এসেছেন। কুকুরের ভয়ে ওপরে উঠতে পারছেন না। চীৎকার করে হাঁক দিলেন 'দাদা আছ'। সেদিন কুকুরের কি মেজাজ ছিল। ডাক শুনেই কুকুর তেড়ে এসে সামান্য কামড়ে দিলে। ওপর থেকে লোক ছুটে এসে দাঠাকুরকে ওপরে নিয়ে গেল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাড়াতাড়ি টিংচার আইডিন, ব্যান্ডেজ প্রভৃতি নিয়ে দাঠাকুরের পা বেঁধে দিলেন।

দাঠাকুর বললেন—লোক জন এলে তোমার কুকুরে কামড়াবে বলে কি তুমি ঔষধ-পত্তর নিয়ে তৈরি হয়ে থাক। হেমেন্দ্রপ্রসাদ—তা কেন? এই তো কজন এল তাদের তো কামড়ায় নি। আমার কুকুর ভদ্রলোক চেনে—

দাঠাকুর উত্তর দিলেন—তা নয় কায়েতের কুকুর তো, বামুনের পা পেয়ে ছাড়তে চায় না। কায়স্থ হেমেন্দ্রপ্রসাদ হাসতে লাগলেন।

*

বহরমপুর মিউনিসিপ্যালিটিতে দুজন সদস্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একজন রমণীমোহন সেন অপর হল নীলমণি ভট্টাচার্য।

দুজনেই দাঠাকুরের সুপরিচিত।

দাঠাকুর ভবিষ্যৎবাণী করলেন। রমণীর জয় নিশ্চয়। নীলমণির পরাজয়।

ফলাফলে দেখা গেল। হলোও তাই।

দাঠাকুর বললেন—ও আমি আগেই জানতুম রমণীর (raw money-র) সঙ্গে নীলমণি (Nil money) পারবে কেন?

*

মুর্শিদাবাদের ম্যাজিস্ট্রেট এডিকের সম্বর্ধনা। দাদাঠাকুরের ডাক পড়েছে।

দাদাঠাকুরকে দেখে একজন সাহেবিপনা ধনী তাকে লক্ষ্য করে বললে—এ ডার্টি লোকটা কে হে?

—দাদাঠাকুরের কানে গেল।

প্রথমেই দাদাঠাকুরের ডাক এল। উঠেই তিনি জানতে চাইলেন ইংরেজিতে বলবেন না বাংলায় বলবেন।

সকলে ইংরেজি, ইংরেজি।

—প্রোজ না পোয়েট্রি

—পোয়েট্রি

দাদাঠাকুর ইংরেজি পোয়েট্রি সুরু করলেন—

'টু অ্যাপিয়ার বিফোর এ পার্টি'
ইনস্টেড অফ প্রপার্টি'
ইন এ ড্রেস সো ডার্টি'
আই হ্যাভ গট পভার্টি'
দোজ হু হ্যাভ প্রপার্টি'
ইফ ইউ ট্রাই এক্সপার্টি'
মে থিংক ইট সামথিং অড
ইউ মে চার্জ মাই গড''

ইত্যাদি।

*

বেতারে পল্লীমঙ্গলের আসরে দাদাঠাকুরের কথা বলা শেষ হয়েছে। কিন্তু

তখনও দু'মিনিট সময় আছে। বেতার-ঘোষক ইসারায় দুটো আঙুল দেখিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন আর দু মিনিট।

দাদাঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করলেন—

এরপর তোমরা খবর শুনবে। খবরের ইংরেজি NEWS. এই NEWS কথার অর্থ জানো? N মানে north, E মানে east। W. West ও S. south অর্থাৎ পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকেরই খবর পাওয়া যায় বলে এর নাম NEWS। দু' মিনিট শেষ।

*

দাদাঠাকুর একদিন নলিনী সরকারের বাড়ি ঢুকেই বললেন—বুঝলে হে, তোমাদের এই কলকাতা অদ্ভুত শহর।

—কেন এই শহরের ওপর হঠাৎ কি হলো?

—হবে আর কি? রোজ যা হচ্ছে, পাঁজিতে লেখা থাকে বছরে একদিন রাস, আর একদিন ঝুলন। এই কলকাতা শহরে দেখছি নিত্য-রাস, নিত্য-ঝুলন।

—কোথায় দেখলেন নিত্য-রাস, আর ঝুলন—

কেন তোমাদের ট্রামে-বাসে যেমন rush তেমনি ঝুলন।

*

একদিন বড়লোকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে পরদিন খুব ঢেকুর তুলতে লাগলেন।

নলিনীকান্ত বললেন—কি হল আপনার?

মুখ বিকৃত করে দাদাঠাকুর বললেন—কালকের ঐ ব্রাহ্মণভোজনের পর সারা রাত্রির পেট্রিয়ট হয়ে বিছানায় পড়ে ছটফট করেছি।

—পেট্রিয়ট হয়ে। সে আবার কি?

—পেটের মধ্যে রায়ট (riot) বাধে বলেই তো লোকে পেট্রিয়ট (patriot) হয়। আর বলিস কেন ভাই লুচি, মাংস, পোলাও, ক্ষীর সন্দেশ পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ায়, সেই সব অপরিচিতদের দেখে পেটের যারা বাসিন্দা—ডাল ভাত, শাক-চচ্চড়ি সব একত্রে উচ্চৈস্বরে who are you, who are you, করে riot বাধিয়ে দিলে। তোর কাছে যখন এলুম—তখনও একবার who are you (ঢেকুর) হাঁক ছাড়লে।

*

দাদাঠাকুরের উক্তি—দেশের নেতারা কেবল নে-তা, দেতা নেহি।

*

মুখ্যমন্ত্রী 'বিধান'চন্দ্রের খোস মেজাজের সভা তাই বিধান সভা।

আর 'বি' গত হয়েছে 'ধান'—যাঁর রাজত্ব থেকে তাঁর নাম 'বিধান'।

*

অক্ষয়চন্দ্র সরকার বহরমপুরে যখন ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রও তখন বহরমপুরে। তিনি লিখেছেন—বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে নতুন বঙ্গদর্শন বের করেছেন। ১ম সংখ্যা। সম্পাদকের নিজস্ব সংখ্যাখানিতে শ্রীমতী কর্ত্রীঠাকুরানী সদর পৃষ্ঠায় যেখানে বড় বড় অক্ষরে বঙ্গদর্শন ছাপা আছে—তাতে 'ব' এর নিচে কখন একটা ফুটকি বসিয়ে দিয়েছেন। সম্পাদকের ছোট মেয়ে সবেমাত্র দ্বিতীয় ভাগ পড়ছে, সে বঙ্গদর্শন খানি এনে বাবার কাছে এসে অনুযোগ করলে—বাবা, তুমি যে বলেছিলে বঙ্গদর্শন, এযে দেখছি রঙ্গদর্শন? বঙ্কিমচন্দ্র হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—আমি তো বঙ্গদর্শনই লিখেছিলুম—তবে তোমার মা'র গুণে রঙ্গদর্শন হয়েছে, আমি কি করব মা।

*

বিজয়রত্ন মজুমদার একবার এক জামাইবাবুকে বলেছিলেন—'জামাই-বারিক' পড়েছেন?

শিউরে তিনি উত্তর দিলেন—ভদ্রলোকে পড়ে। বিজয়বাবু উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই না, তারা যে বারিকে বার দিয়ে বসে।

আগুনে যেন ঘি পড়ল। জামাইবাবু জ্বলে উঠলেন, কেরোসিনে আগুন লাগার মতো। বললেন—'অশ্লীল', তোমার সংগে এ পর্যন্ত॥'

পরে শুনেছিলেন—তিনি বারিকের এক সেনা।

॥ চৌদ্দ ॥

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ছিলেন জ্ঞানতপস্বী। কেউ কেউ বা তাঁকে 'চলন্ত বিশ্বকোষ' বলতেন। তাঁর বাড়িতে বহু সম্মানীয় সাহিত্যিক সুধীদের সমাগম সকাল-সন্ধ্যায় হত। বৈঠক রোজই বসত, আলোচনার মাঝে রসালাপও হত। রসিকতার গন্ধ পেলে তিনি খোস-গল্পে আসর সরগরম রাখতেন। কিছু কিছু খোস-গপ্প 'গপ্পলহরী' মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল।

একদিন গীতারত্ন জিতেনবাবু এসে হাজির। তাঁকে দেখেই বিদ্যাভূষণ মশাই বললেন—এস হে গীতারত্ন, গীতার এই শ্লোকটার ব্যাখ্যা করে দাও। এই বলে তিনি গীতার শ্লোকটি বললেন—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥"

গীতারম্ভ সঠিক ব্যাখ্যা সুরু করলেন—

তাই শুনে তিনি বললেন—হলো না, ঠিক হলো না, নতুন ব্যাখ্যা শোন—

এক গুরু আর এক শিষ্য। উভয়েই মদ্যপায়ী। মদ্যপান করেই শিষ্য বললে, গুরুদেব, শাস্ত্র তো মদের পক্ষপাতী নয়, আমরা যে শাস্ত্রবিরোধী কাজ করছি—

গুরুদেব বললেন—কে বললে? শাস্ত্রতত্ত্ব বোঝে কজন? আচ্ছা, গীতা অর্থাৎ হিন্দুর বাইবেল, এর চেয়ে তো আর বড় শাস্ত্র নেই, তাতেও মদের প্রশংসা আছে—মদের মাহাত্ম্যের কথা আছে।

শিষ্য বললে—সে কি গুরুদেব? আমি যদিও সংস্কৃত জানি না, তবুও বাংলা গীতা পড়েছি—তাতে তো মদের কোনও প্রশংসা নেই?

গুরু বললেন—চোখ দিয়ে পড়লে দেখতে পাবে। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—

আমি বৈকুণ্ঠে থাকি না, তবে থাকি কোথায়? 'মদ্‌ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি' মদ্‌ভক্তা অর্থাৎ মদের ভক্তরা যেখানে থাকেন তত্র তিষ্ঠামি—সেইখানেই আমি থাকি। নারদ, কি না না—রদ, একথার কোনও রদ নেই। তবেই বোঝ ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত কারা? মদ বড় ভাল জিনিস হে, অতি বলকারক।

—সকল উপদেশের সার হল গীতা, সেই গীতার আর একটা কথা শোন—

'অত্র সুরা মহেষ্বাসা ভীমার্জুনসমা যুধি' এর মানে কি? অত্র সুরা মহেষ্বাসা অর্থাৎ কিনা মহেশ সা সা। এখানে সুরা কিনা মদ্য পান করলে কি হয়? না, ভীমার্জুন সমা যুধি, যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের যেমন শক্তি, তেমনিই শক্তি হয়। কিন্তু তখন যা তা মদ খেলে হত না। তখনকার সময়ে ভালো মদ করত মহেশ সা। সুতরাং সা সুরা কীদৃশী না মহেশ সা সা, মহেশ সার দোকানের সুরা।

শিষ্য বললে—আগে জানলে, গুরুদেব, এতটা সময় নষ্ট করতুম না। এই বলে একটা কাঁচের গেলাস গুরুদেবের সামনে ধরলে।

গুরুদেব আহ্লাদের সংগে বললেন—কবিকথা মিথ্যে হবার জো নেই। কবি বলেছেন—

"বোতল আর গেলাস
একটু যদি মেলাস,
মিক্‌সচার যে তৈরি হয়
অতি ফার্স্টো কেলাস।"

নাও একটু পরীক্ষা করে দেখ।

চারুবাবু বললেন—গীতারত্ন, তোমার বইএ নতুন ব্যাখ্যাটা সংযোগ করো।

*

প্রায় বৈঠকে একটা না একটা গল্প হত। তারই কয়েকটা এখানে পরিবেশন করছি।

এক ন্যায়শাস্ত্র পড়া ছাত্র কলুর বাড়িতে এসেছে। কলুর বাড়িতে গরুতে ঘানি টানছে। গরুর চোখে ঠুলি, গলায় ঘণ্টা। ন্যায়বাগীশ ছাত্র গরুর গলায় ঘণ্টা দেখে কলুকে জিজ্ঞাসা করল—ওহে গরুর গলায় আবার একটা ঘণ্টা লাগিয়েছ কেন ?

কলু বললে—আমাকে বাড়ির অনেক কাজ করতে হয়। সব সময় গরুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়। তাই গরু যখন ঘুরবে না, ঘণ্টাও বাজাবে না, তখন আমি বুঝবো ঘানি ঘুরছে না।

তখন নৈয়ায়িক ছাত্র তাঁর টনটনে বুদ্ধির দৌড় দেখিয়ে বলল—ঘণ্টা নাড়া দিয়ে কথা, যদি গরু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টা নাড়ে তা হলে কি করে বুঝবে ?

তখন কলু বলল—গরু তো আপনার মতো ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি, এই যা সুবিধে।

*

কোনও এক বিদ্যোৎসাহী রাজার কাছে অনেক বড় বড় পণ্ডিত এসে নতুন কবিতা শুনিয়ে পুরস্কার নিয়ে যেতেন।

একদিন গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের মতো এক পণ্ডিত রাজসভায় এসে হাজির। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন—নতুন কবিতা আছে।

তৎক্ষণাৎ রাজ আদেশে তাঁকে সমাদর করে আসনে বসান হল।

বিশ্রামের পর রাজা তাঁকে বললেন—এবার আপনার কবিতা পড়ুন—

ব্রাহ্মণ গম্ভীর ভাবে পড়লেন—

‘দুগ্ধং পিবতি বিড়ালঃ।’ বলেই থেমে গেলেন।

সভাপণ্ডিত বললেন—তারপর ?

ব্রাহ্মণ বললেন—আজ্ঞে, এই পর্যন্ত।

এই শুনে সভাপণ্ডিত বললেন—কবিতার চারি চরণ থাকার নিয়ম। এতে তা কই ?

ব্রাহ্মণ—কেন মশাই, বেড়ালের কি চারি চরণ নেই।

সভাস্থ সকলে হেসে উঠলেন।

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন—কবি ঠাকুর, কবিতার যে একটি রস থাকে, তাতে কেমন মাধুর্য, তা আপনার কবিতায় কই ?

ব্রাহ্মণ উত্তর দিলেন—সে কি মশাই, দুধের কি রস নেই, খাঁটি দুধে কি মাধুর্য কম ?

আবার হাসি।

তখন রাজা স্বয়ং জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, কবিতা মাত্রেই একটা বিশেষ অর্থ থাকে, তা আপনার কবিতায় কই ?

অমনি ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন—ধর্মাবতার, বিশেষ অর্থ থাকা দূরের কথা, আমার কিছুই অর্থ নেই।

রসবেত্তা রাজা ব্রাহ্মণকে অর্থ পুরস্কার করলেন।

*

অনেক বড়লোকের বাড়িতে পুজোর সময় অধ্যাপক-ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় হয়ে থাকে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ধনীর গৃহে গিয়ে বার্ষিকী নিয়ে আসেন। যাঁরা প্রতি বছর বার্ষিকী পেতেন, তাঁদের নাম খাতায় থাকতো। যদি কেউ দু তিন বছর কোনও কারণে বার্ষিকী না নিতে আসতেন, তাঁর নাম কেটে দেওয়া হত।

এক ব্রাহ্মণের কিছু বার্ষিকী ছিল। তিনি কোন কারণে দুবছর বার্ষিকী নিতে আসতে পারেন নি। তাঁর বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। পরের বছর ব্রাহ্মণ এসে শুনলেন, তাঁর নাম কাটা গেছে। এই সর্বনেশে কথা শুনে ব্রাহ্মণ তো বাবুর কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন।

বাবু দেওয়ানজীর ওপর হুকুম দিলেন ব্রাহ্মণের নাম খাতায় লিখে নিতে। দেওয়ানজী খাতা এনে লেখার জন্য ব্রাহ্মণের নাম জিজ্ঞাসা করলেন—

ব্রাহ্মণ বললেন—লেখ আমার নাম গরু ভট্টাচার্য।

নাম শুনে লেখক তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্রাহ্মণ আবার বললেন—লেখ না হে, সত্যি সত্যিই আমার নাম গরু ভট্টাচার্য।

পরে বাবু এসে স্বয়ং এরকম নামকরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

ব্রাহ্মণ বললেন—মশাই, আমি বড় বিপদে পড়ে দু বছর বার্ষিকী নিতে আসতে পারিনি। এই সামান্য দোষে আমার নাম কাটা যায়। যদি ফের কোন বিপদে পড়ে না আসতে পারি, তা হলে দেখব হিন্দু হয়ে কে আমাঁর এ নাম (গরু) কাটতে পারে।

উদারস্বভাব হারু দত্তের কন্যার বিয়ে। কন্যাকর্তা বিয়ের সমস্ত আয়োজন করে বিবাহসভায় দণ্ডায়মান। বরও এসে উপস্থিত। অধ্যাপকেরা কিন্তু সেই দিনের বিয়ের লগ্ন নিয়ে মহাবিচার আরম্ভ করছিলেন। শেষে স্থির হল, সেদিনের সকল লগ্নই দোষযুক্ত। সুতরাং সেদিন আর বিয়ে হবার উপায় নেই। বরকর্তা শুনে তো দুঃখিত হলেন—কন্যাকর্তার মাথায় বাজ পড়ল। এমন সময় তাঁর গুরুদেব নিমন্ত্রণে এলেন। কন্যাকর্তা ভক্তিভরে চরণপ্রান্তে প্রণাম করে লগ্নের বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন।

গুরু সকল কথা শুনে বললেন—তাই তো আজ যে সব লগ্নই দুষ্ট, তবে গোধূলি লগ্ন অবলম্বন করলে ভালোই হত, তা এখন রাত হয়েছে আর তো গোধূলি নেই।

শিষ্য অর্থাৎ কন্যাকর্তা সোৎসাহে বললেন—আপনার যখন শুভাগমন হয়েছে, তখন গোধূলি নেই কেন? আসুন বিয়ে হবে। আপনার চরণধূলিই গো-ধূলি।

*

এক বোকা চাষা ভট্টাচার্যের টোলে হাজির হয়ে বললে—ঠাকুর, আমাকে একটা বিধেন দিতে হবে।

ভট্টাচার্য জিজ্ঞেস করলেন—কিসের বিধান?

চাষা বললে—আজ আমার বাবার দিবসি শ্রাদ্ধ, তা আমি করতে পারি কি না?

ভট্টাচার্য বললেন—তাতে বাধাটা কি?

চাষা বললে—আমার স্ত্রীর গাময় বেজায় খোস-পাঁচড়া হয়েছে, পুঁজরক্ত বেরোচ্ছে।

ভট্টাচার্য—তোর স্ত্রীর গায়ে খোস হয়েছে তো তোর কি? তোর নিজের গায়ে তো হয় নি?

চাষা বললে—তবে যে আপনারা বলে থাকেন স্ত্রীপুরুষের একই অঙ্গ, সবই মিথ্যে?

*

এক বৈরাগীর বাড়িতে উঠানে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। অসময়ে তাতে একটা কাঁঠাল হয়। বৈরাগীর ছোট ছেলে কাঁঠাল পাড়বার জন্যে আবদার ধরল।

বৈরাগী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—ঐ কাঁঠালে বৈষ্ণবসেবা হবে। ওর জন্য হাঙ্গামা করতে নেই।

ছেলে বুঝল।

ক্রমে কাঁঠাল তক্তপোষের নিচে স্থান পেল। বৈষ্ণবসেবার উদ্যোগ হচ্ছে না দেখে ছেলে জোর তাগিদ দিতে লাগল।

একদিন সু-অবসর বুঝে পত্নী ও পুত্রসহ বৈরাগী সুপক্ক কাঁঠালটি উদর নামক বৃহদ্দেবতার পুজোয় লাগাল। ছেলে বাদ পড়ল না বটে তবে বৈষ্ণবসেবায় হতাশ হয়ে বাপকে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল—বাবা, কই বৈষ্ণবসেবা তো হল না?

তখন বৈরাগী বলল—কেন হল না, বৈষ্ণবসেবাই তো হয়েছে—

"তুই বৈষ্ণব, মুই বৈষ্ণব আর বৈষ্ণব ঘরে।
তিন বৈষ্ণব ঘরে থাকতে কাঁঠাল খাবে কিনা পরে।"

*

এক আখড়ায় ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা হচ্ছিল। তিন চারজন পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে চলে গেলেন। শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কোন পণ্ডিতের তারিফ করল, কেহ বা বলল—অমন ব্যাখ্যা সকলেই করতে পারে।

সেখানে বসে ছিলেন দামু পণ্ডিত।

দামু বললেন—এবার আমি একটু ব্যাখ্যা করি। আপনারা সকলে স্থির হয়ে শুনুন। দামুর হাতে একখানি রামায়ণ ছিল সেখানি খুলেই তিনি সুরু করলেন।

"রাভণো রাক্ষসাধিপঃ।"

'রাভণ' পাঠ করতেই এক শ্রোতা সেটা অশুদ্ধ বলে চীৎকার করে উঠলেন। অমনি অন্য শ্রোতারাও জো পেয়ে বলে উঠলেন—'রাভণ' কখনই হতে পারে না।

দামু পণ্ডিত হটবার পাত্র নন। তিনি সকলকে স্থির হয়ে বসতে বলে দৃঢ়স্বরে বললেন—লোকে না বুঝেই 'রাবণ' উচ্চারণ করে থাকে। কিন্তু প্রকৃত পাঠ 'রাভণ'—কেন শুনুন শাস্ত্র বলছেন—

"কুম্ভকর্ণে ভকারোস্তি ভকারশ্চ বিভীষণে
ত্রীণাং মধ্যে দ্বয়োর্জ্যেষ্ঠ ভকারং কিং ন বিদ্যতে॥"

মশাইগণ, দেখুন, তিন সহোদরের মধ্যে কনিষ্ঠ দুজন কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ, দুজনের নামে 'ভ' আছে, তবে বড় ভাই যিনি তার নামে 'ভ' না থাকা কি কখন সংগত হতে পারে? কাজেই 'রাভণ' পাঠই শুদ্ধ, 'রাবণ' অশুদ্ধ।

*

মতি রায়ের যাত্রা হচ্ছে। অভিসার বেশ জমেছে। ললিতা, বিশাখা, চন্দ্রাবলী প্রভৃতি সখীরা আজ রাত্রে কুঞ্জে যাত্রা করেছেন। কেউ হাতে তাম্বুল, কেউ

কস্তুরী, যুঁই ফুলের মালা, কেউ গোলাপ, কেউ বেলফুলের গড়ে, কেউ বা চন্দন নিয়েছে শ্রীকৃষ্ণকে উপহার দেবার ইচ্ছায়। কত আশা করে কত প্রিয় উপহার নিয়ে তাঁরা কুঞ্জে প্রাণবল্লভ কৃষ্ণের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু কৃষ্ণ আর আসেন না, সখীগণ তাঁর আশাপথ চেয়ে সারা রাত কাটিয়ে দিলেন। ভোরের বেলায় মনের দুঃখে সখীরা নিজের নিজের বাড়ির দিকে ফিরলেন। পথে তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন—কে কি উপহার এনেছ। সকলেই নিজ নিজ উপহারের নাম করলেন। একজন বললেন—বেল, যুঁই ফুলের মালা এনেছি ভাই, কিন্তু আমার এমনই দুর্ভাগ্য যাঁর জন্যে আনলুম, তিনি এলেন না। মালা শুকিয়ে গেল বলে আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষে একজন সখী বললেন—আমি ভাই এনেছি সজনে ফুলের মালা।

সকলে একসঙ্গে বলে উঠলেন—ছিঃ ছিঃ এমন কাজ করে, এত ফুল থাকতে সজনে ফুল।

তখন সেই সখী বললেন—আমি কি তোমাদের মতো বোকা। আমার আপশোষের কিছু নেই। যদি কৃষ্ণ আসতেন, তাঁর গলায় পরিয়ে দিতুম, যখন এলেন না, তখন সুতো খুলে সজনে ফুলের চচ্চড়ি করে খাব।

*

বিদ্যাভূষণ মশাই বৈষ্ণব ছিলেন—যদিও তিলক বা কণ্ঠিধারণ করেন নি। তা সত্ত্বেও বৈষ্ণবদের নিয়ে মাঝে মাঝে রঙ্গরস করতেন। একবার কোন কথা-প্রসঙ্গে শাক্ত বৈষ্ণবের কথা ওঠে। সেই সময় তিনি বলেন—শক্তিপুজোর প্রধান অঙ্গ 'পঞ্চ-মকার'। যেমন—মদ্য, মাংস, মুদ্রা, মৎস্য ও মৈথুন। আপনারা কি ভাবছেন বৈষ্ণবদেরও কি পঞ্চ মকার নেই? আছে,

তাদেরও আছে—যেমন মালা, মালপো, মালসাভোগ, মালঞ্চ আর মাধুকরী-বৃত্তি বুঝলেন? শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে বলিও আছে—শক্তিপুজোর প্রধান অঙ্গ—পশুবলি, আর বৈষ্ণবদের প্রধান অঙ্গাবরণ—বৈষ্ণবরসে সিক্ত 'নামাবলী'।

*

এক বৈষ্ণবের আখড়ার পাশে এক শাক্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে বৈষ্ণব-শাক্তে বাদানুবাদ চলত। একদিন বৈষ্ণব শাক্তকে বলল—বেশ ভালো করে বিচার করে দেখলে বলতে হয় তোমাদের ছাগবলিতে একটা ভারি অন্যায় নিয়ম আছে। শাক্ত বলল—কি অন্যায় নিয়ম দেখলে? বৈষ্ণব তখন বলতে আরম্ভ করল—প্রায়ই দেখতে পাই তোমরা বলি দেবার জন্যে এক মায়ের পেটের দুটি কখন চারটি ছাগ-শিশু এনে একে-একে বলি দিয়ে থাক। এ কাজটি বড় অন্যায়—অশাস্ত্রীয়।

বৈষ্ণবের কথা শুনে শাক্ত বলল—কেন অশাস্ত্রীয় ?

বৈষ্ণব উত্তর দিল—একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে কেন অশাস্ত্রীয়। প্রথম ছাগ-শিশুটিকে যখন বলি দিলে তখন তো তার মৃত্যু হল তার মৃত্যুতে অপরগুলির নিশ্চয়ই অশৌচ হল। সেই অশুচি পশুকে বলি দেওয়া তোমার কোন শাস্ত্রে লেখে ? এটি কি অবিধি নয়, এতে কি অনপেক্ষ দৃষ্টিতে দোষ হয় না ?

শাক্ত তখন গম্ভীরভাবে উত্তর দিল—বাবাজী, তুমি ভেতরের খবর কিছু জান না, রাখ না বলেই এই অবিধি আর দোষের কথা বলছ। কিন্তু বিচার করে দেখলে তাতে দোষ হয় না। তার কারণ এই—বলিদানের আগে সব পাঁঠাগুলিকেই একেবারে স্নান করিয়ে এনে তাদের বৈষ্ণবমতে ভেক দেওয়া হয়। তারপর এক-একটি করে বলিদান করতে আরম্ভ করা হয়। বাবাজী, এখন বল দেখি, ভেকধারীদের আর অশৌচ সম্ভাবনা আছে কি ?

*

কোনও প্রতিষ্ঠানে বিদ্যাভূষণ মশাইকে সভাপতি করবার জন্য কয়েকজন কেবল আপনি বিরাট পণ্ডিত, মহাপণ্ডিত বলে তোষণ করতে লাগলেন। বিদ্যাভূষণ হেসে বললেন—হ্যা ; আমি পণ্ডিত বটে ; তবে সেই রকম পণ্ডিত যে—'সর্বকর্মং পণ্ডয়তি য সঃ—সব কাজ পণ্ড করে দেয়, বলে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন।

*

বিদ্যাভূষণ মশাই প্রত্যহ প্রাতর্ভ্রমণ করতেন দেশবন্ধু পার্কে—প্রায়ই সংগী থাকতেন প্রফুল্লকুমার সরকার, রাজেন্দ্রনাথ দে, ডাঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। রাজেনবাবু স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অনেক পরামর্শ দিতেন। বলতেন সকালে পার্কে রোজ বেড়াবেন—ইত্যাদি। বিদ্যাভূষণ মশাই বলেন—ঠিক বলেছেন—শাস্ত্রেও আছে—"পারং অর্কয়তি ইতি পার্কঃ'—অর্থাৎ পরপারে যাবার আলো যে দেয় সেই পার্ক।

*

পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর কলেজ ফেরতা প্রায়ই বিদ্যাভূষণ মশাই-এর বাড়িতে আসতেন—আর অনেক পুরাণো কালের গল্প বলতেন। একদিন এক ছাত্র এসেছে। পূর্ণবাবু তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—ওহে কি পড় ? ছাত্রটি উত্তর দিলে—বাংলায় বি এ। অমনি প্রশ্ন—বল দেখি মূর্খ বানান কি ? ছেলেটি অবাক, আস্তে আস্তে বলল—ময়ে উ খ এ রেফ। তিনি বেশ জোরে বললেন—তুমি একটি মূর্খ, বর্ধন যদি দ-এ ধ-এ রেফ হয়, মূর্খ কেন ক-এ

খ-এ রেফ হবে না। আবার প্রশ্ন—কলেজ মানে কি ? বিদ্যাভূষণ মশাই ছেলেটির দুরবস্থা দেখে বললেন—কলে জাত ইতি কলেজ। ইত্যাদি।

*

সেকালে শিবু বিশ্বাস কলকাতায় মস্ত বড় লোক ছিলেন। তাঁর এক ভাই ছিল। ভাই-এর মাথা সব সময় প্রকৃতিস্থ থাকত না। সময় সময় বিগড়ে যেত। যাবার একেবারে কারণ কিছু যে ছিল না তা নয়। ভাইটি অহিফেন-প্রিয় ছিল, তার ওপর অত্যাধিক গঞ্জিকা সেবন করত। একদিন বিশ্বাস মশাই চটে-মটে গাঁজার বাক্সের চাবি হেদোর জলে ফেলে দিলেন। সারাদিন গাঁজা না খেতে পেয়ে তার পেট ফুলতে লাগল। রাত্রে আর সে থাকতে পারল না। রাত দুটোর সময় সে আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে এল। সিমলে বাজারে এসে দাঁড়াল। সব দোকান বন্ধ। শীতকালের রাতে কুয়াসায় পথ অন্ধকার করে আছে। সে নির্ভয়ে অন্ধকার ভেদ করে বাজারের ভেতরে ঢুকে এক দোকানেব সামনে দাঁড়িয়ে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে বলল—ও মুদি তোর ঘর জ্বলে গেল। ঘর জ্বলে গেল। মুদি ঘুমচ্ছিল। দোকান ঘরে আগুন লেগেছে শুনে—"সে তাড়াতাড়ি ঝাঁপ-টাঁপ ভেংগে একেবারে বাইরে এসে পড়ল। যেমনি সে বেরিয়েছে অমনি বিশ্বাসের ভাই মুদির সামনে হাত পেতে মৃদু স্বরে বলল—"মুদি একটু গাঁজা দে।"

*

এক গরীব ব্রাহ্মণ অনেক কষ্ট করে কিছু টাকা সংগ্রহ করেন। টাকাগুলো ঘরে রেখে দিলে খরচ হয়ে যাবার ভয়ে কিছু সোনা কিনে ইচ্ছে করলেন ব্রাহ্মণীর জন্য কয়েকখানা গয়না গড়াবেন। স্বর্ণকাররা সোনা চুরি করে এটুকু তাঁর জানা ছিল। চুরি হবার ভয়ে স্যাকরাকে বাড়িতে ডেকে আনলেন। তারা বাপ-ছেলে দুজনেই বাড়িতে এসে গয়না গড়তে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণ খুব সতর্ক হয়ে সেখানে বসে রইলেন। সামনে প্রহরী থাকায় সুযোগ পেয়েও তারা আত্মসাৎ করতে দ্বিধা বোধ করছে। তাই স্যাকরা নিজের সাধুতা দেখাবার জন্য বলতে লাগল—দাদাঠাকুর, আমরা আপনাদের দরজায় খেয়েই মানুষ। কর্তার আমলে ঐ দরজায় বসে কত গয়নাই না গড়িছি। আহা কি লোকই ছিলেন তিনি। আমাকে কখনই অবিশ্বাস করতেন না। আর আমাকে ছাড়া কারুর কাছে গয়না গড়াতে দিলে তাঁর মনে ধরত না। যা হোক দাদাঠাকুর, বড্ড যে বেলা হয়েছে। আপনার যে সকাল সকাল স্নান করা অভ্যাস। যান শীঘ্র স্নান করতে যান ; তারপর আবার ত ঠাকুর সেবা আছে। সোনা তো ওজন

করেই দিয়েছেন।' এই ভূমিকার পর একটু হেসে বললেন—দাদাঠাকুর। আমাকে অবিশ্বাস করছেন না কি ?"

ব্রাহ্মণ—বললেন—না, না, এখনও বেশি বেলা হয় নি, তোমরা কাজ কর।

এদিকে স্যাকরা কথায় কথায় সোনা গলিয়ে মাটিতে ঢালবার সময় কিছু সোনা ধুলোর মধ্যে লুকিয়ে রাখল। এমন কৌশলে রাখলে ব্রাহ্মণ তা দেখতে পেলেন না। কিন্তু স্যাকরার ছেলে ধুলোর ভেতর ঐ সোনাটুকু দেখতে পেয়ে, পাছে ব্রাহ্মণ দেখতে পান, সেই ভয়ে সেখান থেকে লুকিয়ে তুলে জলের পাত্রে রেখে দিল। ফেলবার সময় ব্রাহ্মণের দৃষ্টি এড়াল না। ব্রাহ্মণ কিন্তু কিছু না বলে তাদের অজ্ঞাতসারে সোনাটুকু জল থেকে তুলে নিজের কাপড়ের খুঁটে রাখলেন।

কিছুক্ষণ পরে স্বর্ণকার ধুলোর ভেতর লুকোনো সোনা দেখতে না পেয়ে ছেলেকে লক্ষ্য করে কীর্তনের সুরে গান ধরল—

'সোনার গৌরাঙ্গ কোথায় গেল আমার সোনার গৌরাঙ্গ'

গানের ছলে বাপের প্রশ্ন বুঝতে পেরে ছেলেও ঐ সুরে উত্তর দিল—

'ধুলায় ধূসরিত হয়ে গৌরাঙ্গ জলে নেমেছেন।'

ব্রাহ্মণ পিতা-পুত্রের সঙ্কেত বুঝতে পেরে তখনই কাপড়ের খুঁট খুলে ঐরূপ কীর্তনের সুরে বলে উঠলেন—

'ওরে গুওটা, জল হতে উঠে গৌরাঙ্গ, আমার খুঁটে এসেছেন।'

॥ পনের ॥

এক ফকির প্রত্যেক দিন বাদশাহের দরবারে যায়। বাদশাহ পরম ধার্মিক। পিতৃভক্ত, প্রজাবৎসল। যতক্ষণ দরবার চলে ফকির ততক্ষণ দরজার সামনে চুপটি করে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। দরবার ভাঙলে ফকির চলে যায়। সে যে জায়গায় দাঁড়ায় সেখান থেকে বাদশাহকে দেখতে পাওয়া যায়। বাদশাহও রোজ তাকে দেখতে পান। ফকিরের কথাবার্তা কিছু নেই, কেবল দাঁড়িয়ে থাকা আর চলে যাওয়া। তিন মাস কেটে গেল। একদিন বাদশাহ তাকে ডাকলেন, বললেন ফকির সাহেব, তুমি রোজ এমন করে দাঁড়িয়ে থাক কেন? কিছু বলবার আছে ? স্বচ্ছন্দে বলে যাও, কোন ভয় নেই। ফকির বলল—আমার কোন আর্জি নেই, হুকুম হলে আমি চলে যেতে পারি। বাদশাহ তাকে

অগত্যা যেতে বললেন। ফকির কিন্তু রোজই দাঁড়িয়ে থাকে। আবার একদিন বাদশাহ ডাকলেন এবং কেন দাঁড়িয়ে থাক জেদ করতে লাগলেন। তখন ফকির বললে—জাঁহাপনা, আমার বলবার কিছু নেই, তবে আমি রোজ আসি তার একটা বিশেষ কারণ আছে—তবে সেটা আমি বলতে রাজি নই। জাঁহাপনা আমায় মাপ করবেন।

বাদশাহ না শুনে ছাড়বেন না। অগত্যা ফকির বলল—দেখুন জাঁহাপনা। আমি যে কুটিরে থাকি তার পাশে এক বৃদ্ধ ফকির থাকে। সে আগে খুব বড় লোক ছিল। আপনার পিতৃদেব স্বর্গগত বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে ২ লক্ষ আশরফি ধার নিয়েছিলেন। শোধ দেবার আগেই আপনার পিতৃদেবের মৃত্যু হয়। ঋণদাতার অবশিষ্ট টাকাও নষ্ট হয়ে যায়। শেষে তিনি বাধ্য হয়ে ফকিরী গ্রহণ করেন। সম্প্রতি খোদার আদেশ হয়েছে কিছু আপনার ওপর। সেটা জানবার জন্য এখানে এসে থাকি।

ধর্মপ্রাণ বাদশাহ সাগ্রহে প্রশ্ন করলেন—খোদার হুকুম কি? জানব কেমন করে?

ফকির—সেটুকু বলা আমার নিষেধ। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি, দূরে ঐ বনের ভেতর খোদার হুকুম আছে। কোনখানে আমি জানি না।

বাদশাহ শোনবামাত্র বনে অনুসন্ধানের জন্য লোক পাঠালেন। তারা ফিরে এসে খবর দিল কোথাও কিছু নেই। ফকিরের ডাক হল। ফকির ভালো করে খুঁজতে বলল। শেষে বাদশাহ নিজে কয়েকজন অনুচর নিয়ে খুঁজতে গেলেন। অনেক খোঁজার পর একজন এসে বললে—খোদার হুকুম মিলেছে। বাদশাহ সেখানে এসে দেখেন একটা উঁচু গাছের মাথার একটা ডালে ছুঁচ দিয়ে কি যেন লেখা রয়েছে। একজন গাছের ওপর উঠে আল্লার হুকুম পাঠ করে বাদশাহকে বললেন—২ লক্ষ আশরফি ফকিরকে দিয়ে বাদশাহর পিতৃঋণ শোধ করতে আদেশ করেছেন। পিতৃভক্ত পুত্র প্রাসাদে ফিরেই বৃদ্ধ ফকিরকে আদিষ্ট টাকা দিতে মন্ত্রীকে আদেশ করলেন। মন্ত্রী কিন্তু এসে বাদশাহের কাছে আবেদন করলেন যে তিনি নিজে আল্লার আদেশ দেখে তবে অর্থ দেবার ব্যবস্থা করবেন। বাদশাহ স্বীকৃত হলেন। মন্ত্রী দেখে এসে বাদশাহকে বললেন—জাঁহাপনা অর্থ দেওয়া হবে না।

বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন—কেন?

উওরে মন্ত্রী বললেন—বিস্‌মিল্লায় গলদ যে।

বাদশাহ—সে কি?

মন্ত্রী—লোকে কোন কিছু লেখবার আগে আল্লার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে লেখে "বিসমিল্লার্-রহমা-নীর-রহীম্।" এখানে দেখছি খোদা নিজে হুকুম দিয়েছেন। বেশ—তিনি কেন লিখবেন—বিসমিল্লার্-রহমা-নীর-রহীম্।" আল্লা নিজে আল্লার অনুগ্রহপ্রার্থী হবেন কেন? এখানেই গলদ। কাজেই টাকা দেওয়া যেতে পারে না।

বাদশাহ—বিস্মিল্লায় গলদই বটে। তবে রে ফকির।—

*

আর একদিনের বৈঠকী কথা।

সকাল বেলা মুদির দোকানে এক ধোবা গোঁফ কামিয়ে কাঁদতে কাঁদতে কিছু জিনিস কিনতে এসেছিল।

মুদী তাকে সেই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলে—এ ধোবী, তুম্ কেঁও রোতা হৈ; কেঁও মুছ মুড়ায়া হ্যায়।

ধোবা আরও একটু কাঁদতে কাঁদতে বললে—মোদীজী, সত্যনাশ হো গয়া, কেঁও তুম্ নঁহী জানতে, গন্ধর্বসেন মর্ গয়া, উসীকে লিয়ে মৈ রোতা ঔর মুছ মুড়ায়া হ্যায়।

মুদী তাই শুনে বললে—বড়ে আফশোষ কী বাত হ্যায়, মুঝকোভী মুছ মুড়ানা চাহিয়ে—এই বলে সেও কাঁদতে লাগল। ধোবা তার জিনিস কিনে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে এক নাপিত এল মুদীর দোকানে। মুদীর গোঁফ কামিয়ে দিলে আর তাকে কাঁদতে দেখে জিজ্ঞেস করল—মোদী, তুম কেঁও মুছ মুড়ায়া ঔর রোতা হ্যায়, মেরে সমঝমে নহী আতা। মুদী বললে—আরে, তুম কো মালুম নহী হ্যায়, কাল রাতকো গন্ধর্বসেন মর গয়া, কিতনে আফশোষ কী বাত হ্যায়, হায় হায়।

নাপিত—ক্যা, গন্ধর্বসেন মর গয়া, ওহ্ য়হতো আফশোষ কী বাত হ্যায়। মুঝেভী মুছ মুড়ানা চাহিয়ে—এই বলে নাপিত কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল কামাতে।

নিজের গোঁফ কামিয়ে নাপিত মন্ত্রীর বাড়িতে গেল কামাতে। মন্ত্রী তাকে ওই অবস্থায় দেখে বলে উঠলেন—কেঁও হজাম, তুম রোতা হ্যায় কেঁও। ঔর মুছ কাহে মুড়ায়া, ক্যা খবর হ্যায়।

নাপিত খুব জোরে কাঁদতে কাঁদতে বলল—উজীর সাহাব। আপ জানতে নেহী হ্যায়, বড়ী বুরি খবর হ্যায়, গন্ধর্বসেন তো মর গয়া হ্যায়।

মন্ত্রী—হায়, হায়, হায়। য়হ ক্যা খবর তুম বোল রাহে হো গন্ধর্বসেন মর গয়া, তব তো হমেভী মূছ মূড়ানা চাহিয়ে।

নাপিত তার গোঁফ কামিয়ে দিলো আর মন্ত্রী সেই অবস্থায় কাঁদতে কাঁদতে রাজদরবারে দর্শন দিতে চলল।

রাজা মন্ত্রীকে ঐ অবস্থায় দেখে ও সব শুনে নিজেও গোঁফ কামিয়ে রাজদরবার বন্ধ করে অন্দর মহলে শোক পালন করতে চলে গেলেন।

শোকাবস্থায় খেতে বসেছেন—রানী পাশে দাঁড়িয়ে। রাজার গোঁফ কামানো আর মাঝে মাঝে হা-হুতাশ করা দেখে রানী জিজ্ঞেস করলেন—মহারাজ মৈ এক বাত আপসে পুছুঁ, আপকী তবিয়ৎ বহুত খারাব হ্যায় ক্যা, কেঁও আপ রোতে হ্যায়। ঔর মুছভী কেঁও মুড়া ডালা হ্যায়।

রাজা—রানী, তুম জানতী নহীঁ হো। বড়া সত্যনাশ হো গয়া হ্যায়, রাজসভাসদ লোগো কো ভী বহুত দুখ হুয়া হ্যায়।

রানী—ক্যা বাত হ্যায়, কুছ কহিয়ে না!

রাজা—বড়ে আফশোষ কী বাত হ্যায়। রানী, গন্ধর্বসেন তো মর গয়া।

রানী—গন্ধর্বসেন, ওহ কৌন থা।

রাজা—গন্ধর্বসেন, গন্ধর্বসেন···মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন—ওহ্ বহুত বড়ী আদমী হোগী, পর মৈ নহীঁ জানতা। ওহ্ তো উজীর কো মালুম হ্যায়।

রানী—তব আপ পুছিয়ে কি ওহ কোন থা?

রাজা রানীর কথা শুনে মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এলেন। রাজা গন্ধর্বসেনের পরিচয় জানতে চাইলেন।

মন্ত্রীও মাথা চুলকোতে চুলকোতে—ম্যয় তো হুজুর নহী জানতা—কি ওহ কোন্ থা, পর ওহ্ কোই বড়া আদমী হী হোগা, উহ হজাম কো ঠিক সে মালুম হোগা।

রাজা—বুলাও হজাম কো···

নাপিত এল। সেও জানে না—মুদী জানে। মুদীকে ডাকা হল—সেও জানে না—ধোবা জানে। বুলাও ধোবীকো। ধোবা এল। প্রশ্ন শুনে সে খুব জোরে কাঁদতে কাঁদতে বললে—মহারাজ, ওজীর জী, গন্ধর্বসেন থা মেরা বড়া পিয়ারা গদ্ধা। ওহ মর গয়া ঔর সাথ হী মেরী জানভী লে গয়া। ইসী লিয়ে হাম রোতে ঔর মুছভী মুড়ায়ে হ্যায়।

তখন বোকা রাজা আর রাজ পারিষদরা সকলেই লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল।

*

বাদশাহের ইচ্ছে হল বাগানবাড়িতে বেড়াতে যাবেন। নিজের ছেলে আর বীরবল উজীরকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলেন। সেখানে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করার পর ভারবোধ হওয়ায় বাদশাহ আপনার অংগবস্ত্র বীরবলের হাতে দিলেন। বীরবল বস্ত্রখানি নিজের কাঁধে রাখলেন। কিছুক্ষণ পরে বাদশাহের ছেলেও নিজের গাত্রবস্ত্র বীরবলের কাঁধে দিলেন। পরে বীরবলের দিকে নজর পড়ায় বাদশাহ তার কাঁধে অনেকগুলি বস্ত্র দেখে রহস্য করে বললেন—কেঁওজী বীরবল, বড়ী অচ্ছী হুয়ী।

বীরবল—ক্যা, বাদশাহ, নমদার।

বাদশাহ—দেখতে হৈঁ কি তুমনে এক গধেকা বোঝ লিয়া।

বীরবল—বাদশাহ নমদার, আপ জো কহতে হৈঁ, মৈঁ গধেকা বোঝ লিয়া বহ সচ্চী বাত, লেকিন এক গধেকা নহী—দো গধেকা।

*

অকবর বাদশাহ একদিন বললেন—বীরবল, বল দেখি আমি বড় না ইন্দ্র বড়?

বীরবল তখনি উত্তর দিলেন—জাঁহাপনা, আপনিই বড়।

বাদশাহ বললেন—আমি কি সে বড়, আমি ভারতবর্ষের রাজা মাত্র, আর তোমাদের পুরাণে বলে ইন্দ্র স্বর্গরাজ্যের রাজা। স্বর্গের রাজার চেয়ে কি পৃথিবীর রাজা বড় হতে পারে।

বীরবল বললেন—এর কারণ আছে জাঁহাপনা, আমাদের সৃষ্টি-কর্তা ব্রহ্মা আপনাকে আর ইন্দ্রকে সৃষ্টি করে কে ভারী হল তা দেখবার জন্য দাঁড়ি পাল্লায় ওজন করলেন। আপনি ভারী হলেন তাই নেমে এলেন ভারতবর্ষে, আর ইন্দ্র হাল্কা হলেন—তিনি স্বর্গে উঠে গেলেন।

*

আর একদিন বাদশাহ বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি বড় না ঈশ্বর বড়? বীরবল বললেন—আপনিই বড়।

বাদশাহ বললেন—কি সে?

বীরবল উত্তর দিলেন—আপনি ইচ্ছে করলে যে কোন প্রজাকে রাজ্য থেকে

বার করে দিতে পারেন—কিন্তু ঈশ্বর কোনো প্রজাকে তার নিজ রাজ্য থেকে বার করে দিতে পারেন না।

উত্তর শুনে অক্‌বর হাসতে লাগলেন।

*

একদিন অক্‌বর দরবারে বসে বীরবলকে বললেন আগ্রায় যত আহাম্মক আছে—তাদের একটা ফর্দ তৈরি করে দাও—

বীরবল ১৫ দিন সময় নিয়ে ফর্দ তৈরি করতে লাগলেন।

১৫ দিন পরে অক্‌বর বীরবলকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে ফর্দ তৈরি?

বীরবল—আজ্ঞে, হ্যাঁ জঁহাপনা। ফর্দ তৈরি নিন।

ফর্দ দেখেই অক্‌বরের চক্ষু ছানাবড়া। সব প্রথমেই নাম—আবু জলালুদ্দীন অক্‌বর।

তিনি চটে গেলেন, বললেন—আমি কি আহাম্মকী করেছি যে আমার নাম প্রথমেই দিয়েছ।

বীরবল বললেন—হুজুর সেদিন পারস্য থেকে সদাগরেরা ঘোড়া বিক্রী করতে এল। তাদের কাছ থেকে ঘোড়া কিনলেন আর ভালো ঘোড়া নিয়ে আসবার জন্যে এক লক্ষ টাকা দাদন দিলেন। তারা ঘোড়া না আনলে আপনি কি করবেন?

অক্‌বর চটে বললেন—তুমি দেখো তারা ঠিক ঘোড়া নিয়ে আসবে আর আমার দাদন শোধ করবে।

বীরবল—সে দিন আমিও আপনার নামটি কেটে তাদের নাম বসিয়ে দেব।

*

একজন একটা কাকাতুয়া পাখি কিনে তাকে একটি কথাই শিখিয়েছিল। পাখিটেকে প্রশ্ন করলে প্রত্যেক কথায় সে উত্তর দিত—'এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।'

পাখিটাকে নিয়ে একদিন সে এক আমিরের কাছে এল বিক্রি করার জন্য।

আমির পাখিটাকে দেখে দাম জিজ্ঞেস করলে বিক্রেতা বললে—'একশ টাকা'।

আমির পাখিটাকে জিজ্ঞেস করলে—তোমার দাম একশ টাকা।

পাখিটা বলল—এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।

আমির আনন্দের সঙ্গে পাখিটাকে কিনে নিয়ে ঘরে চলে গেল। বাড়ি

গিয়ে আমির দেখল-পাখিটা সব কথারই এক উত্তর দেয়। 'এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।'

আমির নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ করে বলল—আমি কি মূর্খ্য যে পাখিটার একটা কথায় ভুলে গেলুম।

অমনি পাখিটা বলে উঠল—'এ বিষয়ে কি আর সন্দেহ আছে।'

আমির তখন খুশি হয়ে পাখিটাকে খাঁচা থেকে মুক্ত করে দিলে।

●

"সব মানুষই কিছু না কিছু হাসে, কিন্তু
যারা বেশি হাসতে পারে তারাই দীর্ঘ
জীবন বেঁচে থাকার সৌভাগ্য লাভ করে"

—ডাঃ জে ওয়ালিস

গ্রন্থপঞ্জী

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগরের জীবনী

হরিমোহন মুখোপাধ্যায় : বঙ্গ ভাষার লেখক

নগেন্দ্রনাথ সোম : মধুস্মৃতি

শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্কিম-জীবনী

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

: আত্মচরিত

নবীনচন্দ্র সেন : আমার জীবন

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের—গ্রন্থাবলী

মন্মথনাথ ঘোষ : কবি হেমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ

নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত : কান্তকবি রজনীকান্ত

রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় : প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশের জীবনী

দেবকুমার রায় চৌধুরী : দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনী

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রানী চন্দ : ঘরোয়া, জোড়াসাঁকোর ধারে

মৈত্রেয়ী দেবী : মংপুতে রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবন স্মৃতি

নলিনীকান্ত সরকার : দাদাঠাকুর

অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায় : রঙ্গালয়ের রঙ্গ কথ

: শরৎচন্দ্রের জীবনী

গিরীন্দ্রনাথ সরকার : ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র

প্রবাসী, ভারতী, মাসিক বসুমতী প্রভৃতি সাময়িকপত্র।

ইত্যাদি